বিশ্বনবী নূরের রবি

হযরাতুল আল্লামা
মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহঃ)

মুহাম্মদী কুতুবখানা

বিশ্বনবী নূরের রবি

মূল- হযরাতুল আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহঃ)

অনুবাদ- মাওলানা কাজী আনোয়ারুল ইসলাম খান

অধ্যক্ষ

কালু শাহ ফাজিল মাদ্রাসা, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদী কুতুবখানা

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬১৮৮৭৪, মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৬২১৫১৪

প্রকাশনায়
মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকাল
১ম প্রকাশ- ১ মে ১৯৯২ ইং
২য় প্রকাশ- ১ জুন ১৯৯৯ ইং
৩য় প্রকাশ- ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১২ ইং

(সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

হাদিয়া - - ৭৫/-

মুদ্রণে ঃ
আনন প্রিন্টিং প্রেস
নজির আহমদ চৌধুরী রোড,
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

অনুবাদকের কথা

বিশ্ব নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সৃষ্টি নূরের, না মাটির মুসলিম মিল্লাতে অদ্যাবধি বিতর্ক অব্যাহত। এ বিষয়ে দু'টি পক্ষ মাঠে ময়দানে আলোচনার ঝড় তুলতে দেখা যায়। কেউ তাঁর সৃষ্টির বিষয়টিকে বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত। কেউ এ ব্যাপারে স্পষ্ট মত পোষণ করে। যারা প্রিয় নবীর সৃষ্টির বিষয়টি বিতর্কিত হিসেবে পরিগণিত করতে তৎপর, তারা দুইটি কারণে তা করতে পারে। প্রথমতঃ এ ব্যাপারে সম্যক জ্ঞানের অভাব বলে, দ্বিতীয়তঃ জেনে শুনে রহস্যজনক কোন কারণে বিষয়টি মেনে নিতে পারছে না। প্রথমোক্ত কারণে হয়ে থাকলে তাদের জন্য অধ্যায়নের পরামর্শ থাকবে। দ্বিতীয় কারণে হয়ে থাকলে তখনও পূর্ববর্তী নবীগণের সাথে ছলে বলে কৌশলে যারা বিরোধীতা কিংবা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছিল তাদের ইতিহাস তথা পরিণাম জেনে নেয়ার পরামর্শ রইল। প্রথম পক্ষের জন্য অত্র পুস্তক পথ প্রদর্শকের ভূমিকা রাখতে সক্ষম এবং দ্বিতীয় পক্ষের জন্যও তাদের উত্থাপিত তাবত প্রশ্নের উত্তর দানে যথেষ্ট বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। মূল কিতাবটি উর্দু ভাষায় লিখেছেন পাক ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত লেখক মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহঃ)। কিতাব রচনার জন্য শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি তাঁকে। এবং কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি উদীয়মান লেখক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক লুৎফর রহমান এবং এস, এম, ফরিদ উদ্দিনকে প্রকাশনা কল্পে তাঁদের সহায়তার জন্যে।

অনুদিত পুস্তকটি ইতিপূর্বে মাসিক তরজুমানে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বন্ধু মহলের অনুরোধ এবং বর্তমান এর প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে সর্বস্তরের পাঠকের খেদমতে উপস্থিত করার লক্ষ্যে এ প্রয়াস। পুস্তক অনুবাদে ভাষার দৈন্যতা নিঃসংকোচে স্বীকার করে পাঠক মহল থেকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কামনা করি। পুস্তকটি পাঠক মহলে বিশ্বনবী নূর হওয়ার বিষয়ে বিরাজিত সংশয় এবং দ্বন্ধ নিরসনে ভূমিকা রাখতে সহায়ক হলে শ্রম সার্থক হবে।

পুস্তকটি অনুবাদের উদ্দেশ্য মহান প্রভূ সফল করুন এবং অধীনের পরকালের মুক্তি উসিলা করুন।

আমিন, বেহুরমতে ছাইয়্যিদিল মুরছালীন।

সালামান্তে-
অনুবাদক।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ শোকরিয়া। মুফতী আহমদ এয়ার খান নঈমী (রাঃ) রচিত "রেসালায়ে নূর" এর অনুবাদ "বিশ্বনবী নূরের রবি" প্রথম প্রকাশের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় সবকটি সংখ্যা শেষ হয়ে গেলো। অনেক শুভাকাংখী, পাঠক ও প্রকাশকের পুণঃপূনঃ তাগাদা এবং সময়ের চাহিদার কথা বিবেচনা করে বইটি দ্বিতীয়বার প্রকাশের কাজে হাত বাড়াই। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির এ সময়ে প্রকাশনার কাজে হাত দেয়া নিতান্তই দুঃসাহসিক। তথাপি আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা রেখে কাজটি সম্পন্ন করলাম।

সুধী পাঠক মহল ফিতনায় ভরপুর এই যুগে বইটি পড়ে যদি রাসুল করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পরিচয় লাভে সক্ষম হন, তবে নিজকে ধন্য মনে করবো।

বিনীত

অনুবাদক

লেখক পরিচিতি

মুফতী আল্লামা আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহঃ) পাক-ভারত উপমহাদেশের হাতে গোনা কয়েকজন স্বনামধন্য শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম। জীবনের মূহুর্তগুলোকে আল্লাহ ও তদীয় রসূলের সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যয় করে ইতিহাসর পাতায় স্থান লাভ করতে সক্ষম হন। কলমের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে পথহারা মানবজাতির পথ প্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর লিখনী দ্বারা অমর হয়ে থাকবেন তিনি যুগ যুগ ধরে।

জন্ম ও বংশ পরিচিতি ঃ তিনি ভারতের "বাদায়ুন" জেলার "উজানী" নামক স্থানে ১৩২৪ হিজরী মোতাবেক ১৯০৬ ইংরেজী সালে শাওয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হযরত মোল্লা মোহাম্মদ ইয়ার খান (রহঃ) খান বংশের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর বংশসূত্র ইউসুফ যায়ী পাঠানের সাথে সম্পর্কিত। সম্ভবতঃ মোঘল শাসনামলে আফগানিস্তান থেকে তাঁরা ভারতে এসেছিলেন।

শিক্ষার্জন ঃ স্বীয় পিতা থেকে কোরআন করিমসহ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এগার বৎসর বয়সে বাদায়ুন শহরস্থ সামশুল উলুম মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে তিন বৎসরকাল পর্যন্ত তথায় অধ্যয়ন করেন। অতঃপর রেয়াছত মণ্ডুতে অবস্থিত দারুল উলুম মাদ্রাসায় চার বৎসর পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। তারপর তাঁর চাচাতো ভাই যিনি মোরাদাবাদে থাকতেন তাঁর অনুরোধে আল্লামা নঈমুদ্দীন মোরাদাবাদী (রহঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করার প্রস্তাব দিলে তিনি তথায় গিয়ে সাক্ষাৎ গ্রহণ করেন। ছদরুল আফাজেল আল্লামা নঈমুদ্দীন (রহঃ) তাঁর নিকট পরীক্ষামূলক কিছু প্রশ্ন পেশ করলে তিনি যে উত্তর দেন এতে অত্যধিক তুষ্ট হন। অতঃপর তিনি নঈমুদ্দীন (রহঃ) প্রতিষ্ঠিত জামেযা নঈমীয়াতে ভর্তি হলেন। ছদরুল আফাজেল তাঁর প্রতিভা দেখে স্বয়ং তাঁকে পড়াশুনা করাতে লাগলেন। কিন্তু ব্যস্ততা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে শুরু করলে তিনি নিজের স্থলে মোস্তাক আহমদ কানপুরীকে নিয়োগ করলেন। কিছুদিন পর আল্লামা কানপুরী মিরট চলে গেলে মুফতী সাহেব ছদরুল আফাজেলের অনুমতি নিয়ে তথায় চলে যান। তথায় তিন বৎসর অধ্যায়ন করতঃ বিশ বৎসর বয়সে সনদপ্রাপ্ত হন। ছদরুল আফাজেল তাঁকে স্বহস্তে দস্তারবন্দী করান।

শিক্ষার্জনে অধ্যবসায় ঃ বিদ্যার্জন করতে গিয়ে মুফতী সাহেব অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেন। তাঁর অধ্যয়নের নিয়ম ছিল যে, আগামীকাল ক্লাশে যে পাঠদান করা হবে তা যে কোন প্রকারে দেখা নেয়া। তাই দীর্ঘরাত পর্যন্ত পড়াশোনা করতেন। মাদ্রাসা প্রদত্ত বাতির তৈল অর্ধরাতে নিঃশেষ হয়ে গেলে তিনি রাস্তার গলিতে জলন্ত বাতিতে কিতাব দেখতেন।

একদিন ছাত্রদের হৈ হুল্লোড় জনিত কারণে তিনি ক্লাশের পড়া দেখতে না পেরে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লে শিক্ষক তা উপলব্ধি করে তাঁর কক্ষ আলাদা করে দেন। এবং তাঁকে সদা অজু অবস্থায় অধ্যয়ন করতে উপদেশ প্রদান করলে তিনি তা যথাযথ বাস্তবায়নে যত্নবান হন। পারস্পরিক পাঠ পর্য্যালোচনা নিত্য নৈমিত্তিক স্বভাবে রূপ নেয়।

ওস্তাদ প্রদত্ত বক্তব্য প্রশ্নোত্তর সমেত ছাত্রদের নিকট পুনঃ উপস্থাপন করতে তাঁকে বেগ পেতে হতো না।

অধ্যাপনা ঃ হযরত নঈমুদ্দীন মোরাদাবাদী (রহঃ) স্বীয় মাদ্রাসায় তাঁকে অধ্যাপনার দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে তাঁর অধ্যাপনা জীবনের সূচনা করেন। অতি অল্প সময়েই তিনি আপন যোগ্যতা বলে লোক সম্মুখে কৃতিত্বের সাথে আত্মপ্রকাশে সমর্থ হন।

এক বৎসর অধ্যাপনার পর গুজরাটের ধৈারাজীতে অবস্থিত দারুল উলুম মিছকিনিয়া নামক মাদ্রাসার পক্ষ থেকে ছদরুল আফাজেল এর নিকট একজন সর্ব বিষয়ে পারদর্শী লোক নিয়োগের আবেদন করলে তিনি মুফতী সাহেবকে তথায় পাঠিয়ে দেন। সেখানে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন। এক সময় প্রাতিষ্ঠানিক এবং স্বীয় ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে তিনি সেখান থেকে চলে আসেন কিন্তু ছদরুল আফাজেল তাঁকে পুনরায় স্বীয় প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনায় নিয়োগ করেন। এভাবে এক বৎসর অধ্যাপনার পর হযরত ছৈয়দ আলী হোসাইন আশরাফী মিঞা কুচয়াচা শরীফে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার জন্য একজন যোগ্য লোক প্রদানের অনুরোধ জানালে সেখানে তিনি মুফতী সাহেবকে পাঠান। সেখানে তিনি কিছুদিন অতিবাহিত করার পর পুনরায় মাতৃভূমির দিকে পাড়ি জমান এবং ছদরুল আফাজেল (রহঃ) কে তা অবিহিত করেন। তারপর ছদরুল আফাজেল (রহঃ) তাঁকে আল্লামা ছৈয়দ আবুল বরকাত (রহঃ) এর মাধ্যমে মুফতী সাহেবকে গুজরাটের মৌলানা জালালুদ্দীন শাহ (রঃ) এর দারুল উলুম মাদ্রাসায় পাঠান। কিন্তু সেখানে তাঁর মন না টিকাতে তিনি স্বদেশে ফিরে যেতে উদ্যত হন। কিন্তু পীর ছৈয়দ বেলায়েত শাহ (রহঃ) এর মাধ্যমে গুজরাটের আঞ্জুমানে খুদ্দামুছ্ছুফিয়া প্রতিষ্ঠিত দারুল উলুম মাদ্রাসার জন্য নিয়ে গেলেন। সেখানে এমন হল যে, তিনি গুজরাটের এবং গুজরাট তাঁর হয়ে গেল। সেখানেই তিনি উলমুল মীরাছ ব্যতীত অন্যান্য সকল পুস্তক রচনা করেন্

পারিবারিক জীবন ঃ গুজরাটের ধোরাজীতে অবস্থানকালে তিনি আফগান বংশোদ্ভূত এক সম্ভ্রান্ত পরিবার আবদুল লতিফ খান সাহেবের কন্যার সাথে প্রথম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আল্লামা ছদরুল আফাজেল (রহঃ) এ বিয়ের খোতবা পাঠ করেন। তাঁর সকল সন্তানাদি এই প্রথমা স্ত্রীরই ঔরসে জন্মলাভ করেছিল। ধর্মভীরু, স্বামী ভক্ত এই রমণী পারিবারিক কার্য্যাদি সম্পাদান, নামাজ, রোজা ইত্যাদির যথাযথ অনুশীলনসহ বাড়ীস্থ সকল ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার দায়িত্বও পালন করতেন আন্তরিকতার সাথে। মুফতী সাহেবের কর্তব্য এবং ব্যস্ততার কথা ভেবে তিনি ঘরের সমস্ত কাজ স্বহস্তে আঞ্জাম দিতেন। তিনি আপন মাতৃভূমি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত গুজরাটে স্বামীর জীবন সংগীনি হিসেবে ছিলেন এবং সেখানেই ১৯৪১ ইং সালের ২৩শে মে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে মুফতী সাহেব বড়ই একাকীত্ব ও অসহায় বোধ করেন।

বেশ কিছুদিন পর মুফতী সাহেব বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শ এবং বারংবার অনুরোধের প্রেক্ষিতে গুজরাটে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেন। তিনিও ধর্মভীরু এবং দ্বীনদার ছিলেন। তাঁর ঔরসে কোন সন্তান-সন্ততি জন্মলাভ করেনি। কিন্তু তিনি প্রথম স্ত্রীর সন্তানদের আপন সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

সন্তান-সন্ততি ঃ মুফতী সাহেব দুই ছেলে এবং চার কন্যার পিতা ছিলেন। পুত্র সন্তানদ্বয় হলেন (১) মওলানা মুফতী মোখতার আহমদ খান এবং (২) মওলানা মুফতী একতেদার আহমদ খান। তাঁরা দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দানের ক্ষেত্রে পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে আত্ম নিয়োগ করেন।

নিত্য অভ্যাস ঃ মুফতী সাহেবের কার্য্যাবলী, ব্যস্ততা, পাঠদান, লিখনী, অধ্যয়ন, দরসে কোরআন, ইবাদত তেলাওয়াত, পত্র-পত্রিকা পাঠ, বিনোদন

এবং সাক্ষাৎকার দান ইত্যাদি ছিল তাঁর নিত্য অভ্যাসের অন্তর্ভূক্ত। বর্ণিত কর্মসূচী অনুশীলনের জন্য তিনি নির্দিষ্ট রুটিন অনুসরণ করতেন এবং সে মোতাবেক প্রতিটি কাজ নির্দিষ্ট সময়ে আঞ্জাম দিতেন। নামাজ এবং জামাতের প্রতি অধিক যত্নবান ছিলেন। অধিকাংশ সময় দরুদ পাঠে ব্যস্ত থাকতেন। সর্বদা তাহাজ্জুদের প্রতি একাগ্র ছিলেন। এতে তিনি আত্মার তৃপ্তি বোধ করতেন। দরূদের প্রতি তাঁর এতই জোক ছিল যে, আলাপচারিতার মাঝখানে ফাঁক পেলে সেখানেও দরূদ পাঠ করতেন। মদিনা মুনাওয়ারা জেয়ারতের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। আর তাই তিনি পাঁচ বার হজ্জব্রত পালনে ধন্য হন। ছোটদের সাথে স্নেহবান হয়ে কথাবার্তা বলা তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ছাত্র সংখ্যা ঃ অর্ধ শতাব্দীকাল পর্যন্ত অধ্যাপনা জীবনে অগুণিত ছাত্র তাঁর নিকট থেকে বিদ্যার্জনে দীক্ষিত হন। নিম্নে তাঁদের উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের তালিকা পেশ করা হল। ১. মাওলানা ছৈয়দ মোখতার আশরাফ কচুয়াচারী ২. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ হোসাইন নঈমী ৩. মাওলানা আলে হোসাইন আশরাফী নঈমী ৪. মাওলানা আবদুল করিম ৫. মওলানা আবদুল কাদির ৬. মোখতার আহমদ খান নঈমী ৭. মাওলানা একতেদার আহমদ খান নঈমী ৮. কাজী আবদুন্নবী ৯. মাওলানা লিয়াকত হোসাইন ১০. মাওলানা মসউদুল হাসান ১১. মাওলানা ছৈয়দ জালালুদ্দীন ১২. রিয়াজুল হাসান ১৩. মাওলানা নজর মোহাম্মদ ১৪. মাওলানা ইদ্রিছ ১৫. মৌলানা গোলাম ওকাড়বী ১৬. মাওলানা ছৈয়দ গণী (রহঃ)।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
❖ সূচনা -	১১
❖ "নূর" এর সংজ্ঞা -	১২
❖ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নূর হবার প্রমাণ -	১৯
❖ মুফাচ্ছেরিনে কেরামের অভিমত -	২১
❖ হাদিসে পাকের আলোকে -	২৪
❖ ওলামায়ে কেরামের অভিমত -	২৭
❖ দেওবন্দী আলেমদের অভিমত -	৩১
❖ বিবেকগ্রাহ্য প্রমাণাদি -	৩৪
❖ "নূর" হওয়া সম্পর্কিত বিষয়ের উপর উত্থাপিত অভিযোগ ও এর উত্তর -	৩৮
❖ ছায়াবিহীন কায়া -	৫৯
❖ দেওবন্দী ওহাবীদের বক্তব্য -	৬৭
❖ প্রশ্নোত্তর পর্ব -	৬৮

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় মা-বাবার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনার্থে গ্রন্থখানা তাঁদেরই নামে উৎসর্গ করলাম। - প্রকাশক।

সূচনা

পুস্তিকা আরম্ভ করার আগে কতেক নিয়ম জেনে রাখা প্রয়োজন বলে মনে করি।

(১) 'নূর' শব্দের আভিধানিক অর্থ আলো, চাকচিক্য ও উজ্জ্বল। তবে কোন কোন সময় উহাকেও নূর বলা হয় যদ্বারা আলোকিত করা হয়। এ অর্থে সূর্যকেও নূর বলা যায়। বিদ্যুৎ, চেরাগ ও লাইটকেও নূর বলা হয়ে থাকে।

(২) 'নূর' দু'ধরণের হতে পারে।

ক. ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য (হিচ্ছি) এবং
খ. ইন্দ্রঅগ্রাহ্য বা বিবেক গ্রাহ্য (আকলী)।

'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হল যা চোখে দেখা যায়। যেমন- সূর্যের কিরণ, চেরাগ, বিদ্যুৎ ইত্যাদির আলো। 'বিবেকগ্রাহ্য' হল যাকে চক্ষু বা দৃষ্টিশক্তি অনুভব করতে পারে না। তবে বিবেক বলে দিতে পারে যে ইহা 'নূর' বা 'আলো'। এ অর্থেই ইসলাম, কোরআন, হেয়ায়ত এবং জ্ঞানকে আলো বলা হয়।

এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ উল্লেখযোগ্য-

(১) اَللهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَي النُّوْرِ

অর্থ ঃ আল্লাহ মুমিনদের সাহায্যকারী, তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান। এ আয়াতে পথভ্রষ্টতাকে অন্ধকার এবং হেদায়তকে আলো এবং নূর বলা হয়েছে।

(২) وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُبِيْنًا

অর্থ ঃ এবং আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট 'নূর' অবতীর্ণ করেছি।

(৩) مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكوٰةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ

অর্থ ঃ আল্লাহর 'নূর' এর উদাহরণ ঐ চেরাগদানের মতো যার মধ্যে চেরাগ রয়েছে। এ আয়াতে রাব্বুল আলামীন স্বীয় স্বত্বাকে অথবা বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে 'নূর' আখ্যা দিয়েছেন।

وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُوْرًا يَمْشِيْ بِهِ فِي النَّاسِ (৪)

অর্থ ঃ আর যে ব্যক্তি মৃত ছিল আমি তাকে জীবন দান করেছি এবং তার জন্য 'নূর' বানিয়েছি যাতে সে মানুষের মধ্যে চলতে পারে।

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰي نُوْرٍ مِنْ رَبِّهِ (৫)

অর্থ ঃ অতঃপর যার বক্ষকে আল্লাহ ইসলামের জন্য খুলে দিয়েছেন সে তার প্রভুর পক্ষ থেকে আলোর মধ্যে রয়েছে।

رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا (৬)

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদের 'নূর' পূর্ণ করে দাও। এবং আমাদের গুনাহ মাফ করে দাও।

وَاَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيْهِ هُدًي وَنُوْرٌ (৭)

অর্থ ঃ আর আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছি, এতে রয়েছে হেদায়ত এবং 'নূর' ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন-

فَاِنَّ الْعِلْمَ نُوْرٌ مِنْ نُوْرِ اللّٰهِ وَاِنَّ النُّوْرَ لَايُعْطي لِعَاصٍ.

অর্থ ঃ নিশ্চয় "জ্ঞান" আল্লাহর নূর। আর উক্ত নূর কোন পাপীকে দেয়া হয় না।

(৩) "নূর" এর সংজ্ঞা ঃ

উহাই "নূর" যা স্বয়ং আলোকিত এবং অন্যকেও আলোকিত করে থাকে।

ظَاهِرٌ بِالذَّاتِ مُظْهِرٌ لِلْغَيْرِ

নূর এর এই আলোকিত হওয়া এবং আলোকিত করাকেও দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ক. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (হিচ্ছি) ও খ. বিবেকগ্রাহ্য (আকলী)।

চন্দ্র, সূর্য, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে স্বয়ং আলোকিত এবং অন্যকেও আলোকিত করে।

জ্ঞান, হেদায়েত, ইসলাম, কোরআন ইত্যাদি বিবেক গ্রাহ্য ভাবে নিজে আলোকিত ও অন্যকেও আলোকিত করতে সক্ষম।

(৪) মহান আল্লাহ মূলতঃ স্বত্বাগতভাবে জাতি নূর। তিনি স্বয়ং আলোকিত এবং যাকে তিনি আলোকিত করেছেন সেও আলোকিত হয়েছে। তবে নবীয়ে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম), কোরআন, ইসলাম, ফেরেস্তা, আল্লাহ প্রদত্ত নূর দ্বারা আলোকিত। যেহেতু তিনিই তাদেরকে আলোকিত করে সৃষ্টি করেছেন সেহেতু তাঁরা আলোকিত হয়েছেন। যেমন- মহান আল্লাহ স্বত্বাগতভাবে সদা সর্বদা সর্বশ্রোতা (سَمِيْعٌ) সর্বদ্রষ্টা (بَصِيْرٌ) জীবিত সর্বজ্ঞ (عَلِيْمٌ حَيٌ) সর্ববিষয়ে অবগত আর অন্যান্য সৃষ্টি জগত তাঁর প্রদত্ত শক্তিতে শ্রোতা, দ্রষ্টা, জ্ঞানী ইত্যাদি।

তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন- (اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ) অর্থাৎ নিশ্চয় তিনি অধিক শ্রোতা এবং মহাজ্ঞানী।

অত্র আয়াতে রাব্বুল আলামীন নিজকে নিজে (سَمِيْعٌ) এবং (بَصِيْرٌ) বলে আখ্যা দিয়েছেন। অন্য আয়াতে মানব সম্প্রদায় সম্পর্কে এরশাদ করেন-

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا.

অর্থাৎ ঃ আমি মানব সম্প্রদায়কে মিশ্রিত বীর্য হতে সৃষ্টি করেছি যাতে তাকে পরীক্ষা করতে পারি। অতঃপর তাকে আমি শ্রোতা এবং দ্রষ্টা বানিয়েছি।

তাঁর সমস্ত গুণাবলীর অবস্থা হল যে, তিনি স্বত্বাগতভাবে কারো দান ব্যতীত সমস্ত গুণাবলীর ধারক এবং সৃষ্টি জগত তাঁর প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ঐ গুণাবলীর অধিকারী। একই শব্দ উভয় জাতের জন্য ব্যবহৃত হলেও অর্থের মধ্যে অনেক তফাত রয়েছে।

(৫) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নূর হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, তিনি আল্লাহর স্বত্বাগত মূল দৈহিক নূরের অংশ বিশেষ। এবং এটাও নয় যে, রসূলের নূরের উৎস আল্লাহর স্বত্বাগত মূল নূর। এবং এটাও নয় যে, হুজুরের নূর আল্লাহর মতো স্বত্বাগত চিরস্থায়ী। এটাও নয় যে, রব্বুল আলামীন নবীর মধ্যে ঢুকে গেছেন। যাতে শিরক ও কুফরী সংঘটিত হয়ে যায়। বরং অর্থ ইহাই যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মাধ্যম বিহীন আল্লাহ থেকে ফয়েজ গ্রহণকারী। যেমন- একটি বাতি হতে দ্বিতীয় আর একটি বাতি জ্বালানোর পর দ্বিতীয় বাতি হতে আরও হাজার হাজার বাতি জালান। অথবা

একটি শিশা সূর্যের সামনে রাখুন, এতে শিশাটি জ্বলে উঠবে। তারপর ঐ শিশাটিকে ঐ শিশাগুলোর দিকে ফিরিয়ে দিন, যেগুলো অন্ধকারের মধ্যে অবস্থিত। এতে সমস্ত অন্ধকারস্থ শিশা জ্বলে উঠবে।

এ কথা স্পষ্ট যে, প্রথমোক্ত শিশার মধ্যে সূর্য স্বয়ং এসে যেমন উপস্থিত হয়নি তেমনি সূর্যের অংশ বিশেষ শিশার মধ্যেও রাখা হয়নি। বরং শুধুমাত্র এটাই হয়েছে যে, প্রথম শিশা বিনা মাধ্যমে সূর্যের আলোকে আলোকিত হয়েছে এবং অবশিষ্ট সমস্ত শিশা ঐ শিশা হতে আলো লাভ করেছে। যদি প্রথম শিশাটি মধ্যস্থলে না হত তাহলে অবশিষ্ট সমস্ত শিশাগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে যেত।

উদাহরণস্বরূপ এটা বুঝে নিন যা রাব্বুল আলামীন হযরত আদম (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন-

وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِيْ فَقَعُوْا لَهُ سَاجِدِيْنَ

অর্থ ঃ "আর যখন আমি তাঁকে ঠিক করলাম এবং তাঁর মধ্যে আমি আমার রুহ ফুক দিলাম তখন তোমরা সকলেই তাঁর সামনে সিজদায় অবনত হবে। হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলেন- وَرُوْحٌ مِنْهُ অর্থাৎ তিনি (ঈসা (আঃ)) তাঁর রুহ। এ কারণে হযরত ঈসা (আঃ) কে "রুহুল্লাহ" বলা হয়। ইহার অর্থ এটা নয় যে, আদম (আঃ) ও ঈসা (আঃ) উভয়েই আল্লাহর রূহ এর টুকরো বা অংশ বিশেষ বা আল্লাহ তাঁদের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন।

বরং আদমকে কোন পিতামাতা ছাড়া এবং ঈসাকে পিতার মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ তাঁদের মধ্যে রূহ দান করেন। অনুরূপ নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর 'নূর' হওয়ার অর্থ এটাই যে, তিনি সৃষ্টি জগতের কোন মাধ্যম ব্যতীত প্রভু থেকে ফয়েজ লাভ করেন।

(৬) মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ব্যক্তিত্ব এক কথা, হাকিকতে মোহাম্মদী (দঃ) আর এক কথা। ব্যক্তি মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এ দেহ মোবারকের নাম যা হযরত আদম (আঃ) এর সন্তান হিসেবে হযরত বিবি আমেনার (রাঃ) বংশোদ্ভুত। যিনি সমস্ত নবীগণের পরে দুনিয়ায় শুভাগমন করেছেন। যিনি পৃথিবীতে সর্বপ্রকার সম্পর্কে

সম্পর্কিত। তিনি আমেনা (রাঃ) এর নয়নমনি হওয়া, হযরত আয়েশা (রাঃ) এর শিরোমনি হওয়া, হযরত ইব্রাহীম, তৈয়ব, তাহের, ফাতেমা এর পিতা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়া ব্যক্তি মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়া সাল্লাম) এর গুণাবলী।

সুফীগণের দৃষ্টিতে হাকীকতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হল জাতে মোতলাকা, অর্থাৎ আল্লাহর স্বত্বার প্রথম অস্তিত্বের নাম। কোন প্রকার দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে এটাই বুঝে নিন যে, (আরবী ব্যাকরণ মতে) 'মাজি মোতলাক' যা 'মাছদার' হতে সৃষ্ট। আবার সমস্ত ছিগা মাজি মোতলাক হতে নির্গত। সুতরাং মাঝি মোতলাক 'মাছদার' এর প্রথম অস্তিত্ব এবং অবশিষ্ট অন্যান্য ছিগাসমূহ পরবর্তীতে সৃষ্ট। অনুরূপ আল্লাহ তা'লা সমস্ত তজল্লীর কেন্দ্রবিন্দু। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁর প্রথম তজল্লী। এবং অন্যান্য সৃষ্টজগত তাঁরই তজল্লীর আলোকে সৃষ্ট।

ব্যক্তি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে।

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

অর্থ ঃ হে নবী আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের মতো বশর। হাকিকতে মোহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে স্বয়ং বলেন-

كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ

অর্থ ঃ আমি ঐ সময় নবী ছিলাম যখন আদম (আঃ) মাটি এবং পানির মধ্যে নিহিত ছিলেন। হাকীকতে মোহাম্মদী হযরত আদম (আঃ) এর বংশোদ্ভুত নন, বশরও নন, কারো মতোও নন। তিনি কারো বাপও নন, সন্তানও নন। বরং তিনি সমস্ত সৃষ্টির মূল। উল্লেখ্য যে, বশরিয়তের সূচনা আদম (আঃ) থেকে। অথচ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তখনও নবী যখন আদম (আঃ) এর সৃষ্টির উপাদানও তৈরী হয়নি। যদি ঐ সময়ও ঐ অবস্থায় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বশর হয়, তাহলে আদম (আঃ) না বশর বলে গণ্য হতেন, না আবুল বশর (মানব পিতা) সাব্যস্ত হতেন।

নবীর সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয় যে, ঐ মানুষটিই নবী যাঁকে আল্লাহ তায়ালা শরীয়তের আহকাম প্রচার করার জন্য প্রেরণ করেছেন। উক্ত সংজ্ঞা হল ব্যক্তি নবীর, হাকীকতে নবীর সংজ্ঞা নয়। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ঐ সময় নবুয়াত প্রাপ্ত যখন ইনচানিয়াত বা মানবতার কোন নির্দশনই ছিল না। কারণ তখনও প্রথম মানব তথা মানব জাতির পিতা হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং মানব সৃষ্টির উপাদান এবং স্থানও তৈরী হয়নি। অথচ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নবুয়ত স্থান ও কালের অনেক পূর্বেকার তৈরী। বাদামের খোসাকে যেমনি বাদামের নামানুসারে নামকরণ করা হয় অনুরূপ বাদামের মগজকেও করা হয়। কিন্তু বাদামের মগজের মর্যাদা এবং খোসার মর্যাদা সম্পূর্ণ ভিন্ন। অনুরূপ হাকিকতে মোহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ব্যক্তি মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর মধ্যে নিহিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) "নূর" হওয়া "বোরহান" হওয়া, আল্লাহর অস্তিত্বের দলিল হওয়া, হাকিকতে মোহাম্মদী এবং উহার গুণাবলী। এ প্রসংগটি মসনবী শরীফের মধ্যে ব্যাপক আলোচিত হয়েছে। মৌলভী আশরাফ আলী সাহেব তাঁর "নশরুত তীব" কিতাবে এটা দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেছেন। তফসীর রুহুল বয়ানে সূরা আরাফ ৯ম পারাস্থ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ এর তফসীরে বলা হয়েছে যে, সমস্ত আত্মা হুজুর করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র আত্মা মোবারক হতে সৃষ্ট। তাই হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সমস্ত রূহ বা আত্মা জগতের পিতা।

(৭) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র দেহ মোবারক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে নূরানী ছিল, যা তাঁর সাহাবাগণ, স্ত্রীগণ স্ব-স্ব চোখে অবলোকন করেছেন। যেমন- "শমায়েলে তিরমিজি" এর মধ্যে হিন্দ ইবনে আবু হালা হতে এক দীর্ঘ হাদিস বর্ণিত হয়েছে-

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَخْمًا يَتَلَأْلَئًا وَجْهُهُ كَتَلَأْلُؤِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

অর্থাৎ ঃ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) অতীব সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর পবিত্র চেহারা মোবারক চৌদ্দ তারিখের পূর্ণ চন্দ্রের মত

ঝকঝকে উজ্জ্বল ছিল। হযরত রবী বিনতে মুয়াব্বিজ ইবনে ছাফরা হতে ইমাম দারমী (রঃ) বর্ণনা করেন-

قَالَتْ يَا بُنَيَّ لَوْ رَأَيْتَهُ رَأَيْتَ الشَّمْسَ طَالِعَةً.

অর্থ " হে বৎস! যদি তুমি তাঁকে দেখতে (তাহলে তোমার মনে হত যেন) তুমি উদিত সূর্যই দেখছ।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হতে ইমাম দারমী বর্ণনা করেন-

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَفْلَجُ الثَّنِيَّتَيْنِ إِذَاتَكَلَّمْ رُئِيَ كَالنُّوْرِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ.

অর্থাৎ ঃ নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সম্মুখস্থ দাঁত মোবারকের মধ্যস্থলে ফাঁক ছিল। যখন তিনি কথা বলতেন তাঁর দাঁত মোবারক হতে আলোক ছটা বের হতো।

কোন কোন হাদিসে রয়েছে যে, ঐ আলো দ্বারা রাত্রে হারানো সূচ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যেত।

سوزن گم شده ملتي هے تبسم تيري + رات كو صبح بناتا هے اوجالا تيرا.

অর্থাৎ ঃ আপনার মুচকি হাসিতে হারানো সূঁচ খুঁজে পাওয়া যায়। আপনার দাঁত মোবারকের উজ্জ্বলতায় রাতকে দিনে পরিণত করে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে তিরমিজী, আহমদ, বায়হাকী, ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেন।

كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِيْ فِيْ وَجْهِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ.

অর্থাৎ ঃ তাঁর চেহারা মোবারকে যেন সূর্য ঝলমল করছে।

শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী (রাঃ) "মুদারেজুন্নবুয়ত" এর ১ম খণ্ডে ১১০ পৃষ্ঠায় লিখেন-

ونمي افتاد ان حضرت راسايه برزمين.

প্রথম আয়াতে "নূর" দ্বারা বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে বুঝানো হয়েছে। আলো ব্যতীত যেমনিভাবে কোন কিতাব অধ্যয়ন অসম্ভব তেমনি বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত কোরান শরীফ বুঝা সম্ভব নয়। তিনি আল্লাহর নূর, যা কেউ নিভাতে পারবেনা, যেমনিভাবে চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদিকে নিভাতে পারে না। তাঁর নূরকে কেউ কোন প্রকার অনুমান করতে পারবে না। যেমনিভাবে সমুদ্রের পানি এবং বায়ুকে পারে না। দ্বিতীয় আয়াতেও আল্লাহর "নূর" দ্বারা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলার কোনরূপ দৃষ্টান্ত হতে পারে না। যেমন আল্লাহ স্বয়ং বলেন- (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ) অর্থাৎ তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই।

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّاأَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَدَاعِيًا إِلَيَ اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

অর্থ ঃ হে নবী! আমি আপনাকে "সাক্ষী" "সুসংবাদদাতা" "ভীতি প্রদর্শনকারী" "আল্লাহর হুকুমে তাঁর দিকে আহবানকারী" এবং জ্বলন্ত প্রদীপ করে পাঠিয়েছি। পবিত্র কোরআনে অন্যত্র সূর্যকে "সিরজাম মুনীরা" বলা হয়েছে। সূর্য নিজেও আলোকিত এবং অন্যকেও আলোকিত করে। চন্দ্র, তারকা সবগুলো সূর্যের মাধ্যমে আলোকিত হয়েছে। অনুরূপ বিশ্ব নবীকে সিরাজাম মুনীরা বলা হয়েছে। যেহেতু তিনি আলোকিত এবং সাহাবায়ে কেরাম, আউলিয়ায়ে এজামগণকেও আলোকিত করেছেন। তাঁরা সকলেই বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দ্বারা আলোকিত হয়েছেন।

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

অর্থ ঃ তারা (কাফের সম্প্রদায়) আল্লাহর নূর (অর্থাৎ বিশ্বনবী) কে তাদের মুখ দ্বারা নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ স্বয়ং তাঁর নূরকে পরিপূর্ণকারী, যদিও কাফেররা অপছন্দ করে।

يُرِيْدُوْنَ أَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأبِي اللهُ أَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ.

অর্থ ঃ তারা (কাফেররা) আল্লাহর নূরকে তাদের মুখে নিভিয়ে দিতে চায়। আর আল্লাহ তা মানেন না বরং তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করেন। শেষোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহর নূর দ্বারা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে বুঝানো হয়েছে। কাফেররা চেয়েছিল হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে নিঃশেষ করে দিতে, কিন্তু মহান আল্লাহ বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সমস্ত কার্যাবলীকে পূর্ণতা দান করেছেন।

মোল্লা আলী কারী (রাহঃ) স্বীয় কিতাব "মুওজুয়াতে কবির" এ বলেন বর্ণিত আয়াত সমূহে আল্লাহর নূর অর্থ- হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কলব মোবারকের নূর।

(বর্ণিত আয়াত সমূহ সম্পর্কে)
মুফাচ্ছেরিনে কেরামের অভিমত

(১) বর্ণিত আয়াত সমূহের প্রথমটি সম্পর্কে তফসীরে জালালাইন শরীফে বলা হয়েছে- هُوَ نُوْرُ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

অর্থাৎ ঃ উক্ত আয়াতে "নূর" দ্বারা মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নূরকে বুঝানো হয়েছে।

(২) তফসীরে "সাবী" এর মধ্যে রয়েছে-

قَوْلُهٗ هُوَ النَّبِيُّ اَيْ سُمِّيَ نُوْرٌ لِاَنَّهٗ يُنَوِّرُ الْبَصَائِرِ وَيَهْدِيْهَا الرُّشَادْ وَلِأَنَّهٗ أَصْلُ كُلُّ حِسْيٍ وَمَعْنَوِيٍّ.

অর্থাৎ ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে এ কারণেই নূর বলেছেন যে, তিনি দৃষ্টিশক্তিগুলোকে আলোকিত করেন আর তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বিবেকগ্রাহ্য উভয় প্রকার নূরের মুল।

(৩) উক্ত প্রথম আয়াত সম্পর্কে তফসীরে খাজেনের মধ্যে রয়েছে-

قَدْ جَائَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ يَعْنِيْ مُحَمَّدٌ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّمَا سَمَّاهُ اللهُ نُوْرًا لِاَنَّهٗ يَهْتَدِيْ بِهٖ كَمَا يَهْتَدِيْ فِي الظُّلَامِ بِالنُّوْرِ.

অর্থাৎ ঃ নূর অর্থ হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)। তাঁকে আল্লাহ "নূর" করে নামকরণ এ জন্যেই করেছেন যে, তাঁর নিকট থেকে হেদায়ত গ্রহণ করা হয়, যেভাবে অন্ধকারের মধ্যে আলো দ্বারা পথের দিশা করা যায়।

(৪) তফসীরে "বয়জাবী" এর মধ্যে রয়েছে-

وَقِيْلَ يُرِيْدُ بِالنُّوْرِ مُحَمَّدًا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ.

অর্থাৎ ঃ কোন কোন মুফাচ্ছিরের একটি উক্তি এটাও রয়েছে যে, "নূর" অর্থ হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)।

(৫) তফসীরে "মদারেক" এ রয়েছে-

اَوِ النُّوْرُ مُحَمَّدٌ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِاَنَّهٗ يَهْتَدِيْ بِهٖ كَمَا سُمِّيَ سِرَاجًا.

অর্থাৎ ঃ নূর দ্বারা হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তাঁর নিকট থেকে হেদায়ত লাভ করা যায়। যেমনিভাবে তাঁকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) প্রদীপ নামকরণ করা হয়েছে।

(৬) তফসীরে "ইবনে আব্বাছ তনবীরুল মিকয়াছ" এ রয়েছে-

قَدْ جَائَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ يَعْنِيْ مُحَمَّدٌ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ.

অর্থাৎ ঃ তোমাদের নিকট আল্লাহর নূর অর্থাৎ মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এসেছেন।

(৭) তফসীরে "রুহুল বয়ান" এ রয়েছে-

وَقِيْلَ الْمُرَادُ بِالْاَوَّلِ هُوَ الرَّسُوْلُ وَبِالثَّانِيْ الْقُرْاٰنُ.

অর্থাৎ ঃ বলা হয়েছে যে, প্রথমটি (অর্থাৎ নূর) দ্বারা হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ (কিতাবুম মুবীন) দ্বারা কোরআনকে বুঝানো হয়েছে।

(৮) ৩য় আয়াতে "ছিরাজাম মুনীরা" সম্পর্কে তফসীরে "রুহুল বয়ানে রয়েছে-

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ اللهُ نُوْرًا فَارْسَلَهٗ اِلَي الْخَلْقِ

অর্থাৎ ঃ তিনি ঐ স্বত্বা যাঁকে আল্লাহ নূর বানিয়েছেন। অতঃপর তাঁকে জগতের নিকট পাঠিয়েছেন।

(৯) তফসীরে "বয়জাবীতে" উক্ত আয়াতাংশ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

وَيَقْتَبِسُ مِنْ نُوْرِهٖ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنْوَارُ الْبَصَائِرِ

অর্থাৎ ঃ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নূর হতে সকল দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন জাতি আলো সংগ্রহ করে থাকে।

অনুরূপ সমার্থক বক্তব্য "তফসীরে খাজেন" সহ অন্যান্য তফসীর গ্রন্থে রয়েছে।

(১০) "তফসীরে খাজেন"ও দ্বিতীয় আয়াতের مَثَلُ نُوْرِهٖ অংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলা হয়েছে।

وَقِيْلَ قَدْاَتِيْ هٰذَا التَّمْثِيْلُ لِلنُّوْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ اِبْنِ عَبَّاسٍ لِكَعْبِ الْاَخْبَارِ اَخْبِرْنِيْ عَنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰي مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ - قَالَ كَعْبٌ هٰذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللهُ لِنَبِيِّهٖ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَالْمِشْكٰوةُ صَدْرُهٗ وَالزُّجَاجَةُ قَلْبُهٗ وَالْمِصْبَاحُ فِيْهِ النُّبُوَّةُ فَوْقَهٗ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ هِيَ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ يَكَادُ نُوْرُ مُحَمَّدٍ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاَمْرُهٗ يَتَبَيَّنُ لِلنَّاسِ وَلَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ.

অর্থাৎ ঃ বলা হয়েছে যে, অত্র আয়াতে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নূরের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রঃ) হযরত কা'ব আখবারকে অত্র আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে কা'ব আখবার বলেন আল্লাহ তা'আলা এই উদাহরণ দ্বারা তাঁর নবীর বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং মিশকাত হলো নবীর বক্ষ মোবারক, জুজাজাহ বা ফানুস দ্বারা তাঁর অন্তর মোবারক, যার মধ্যে প্রদীপ হল নবুয়ত, গাছ হল নবুয়তের। অর্থাৎ সহসা নূরে মোহাম্মদী চমকে উঠবে এবং মানুষের নিকট প্রতিভাত হয়ে যাবে যদিও তিনি কথাবার্তাও না বলে থাকেন।

(১১) তফসীরে রুহুল বয়ানে لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রয়েছে যে, একবার হুজুর জিব্রাইল (আঃ) কে প্রশ্ন করলেন যে, তোমার বয়স কত? বললো আমি জানিনা। তবে এতটুকু জানি যে, চতুর্থ আসমানে একটি তারকা সত্তর হাজার বৎসর অন্তর অন্তর উদিত হতো। এটাকে আমি বাহাত্তর হাজার বার উদিত হতে দেখেছি। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বললেন হে জিব্রাইল! আল্লাহর শপথ! আমিই সেই তারকা। আল্লাহ মহানবীর নূর মোবারককে হযরত আদম (আঃ) এর পৃষ্ঠ দেশে আমানত রেখেছেন। তফসীরে রুহুল বয়ানের এ বক্তব্য দ্বারা বুঝা গেল যে, নূরে মোহাম্মদ হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর নূর এর পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন আসমান, জমীন, চন্দ্র, সূর্য কিছুই ছিল না।

হাদিসে পাকের আলোকে

রসুলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর নূর হওয়া সম্পর্কিত অসংখ্য হাদিস বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে পেশ করা হলো-

(১) হযরত আবদুর রাজ্জাক স্বীয় "মছনদে" হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আমি (জাবের) রসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আরজ করলাম, হে আল্লাহর রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমার পিতা-মাতা আপনার পদযুগলে উৎসর্গিত হোক, সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা কোন্ বস্তু সৃষ্টি করেছেন? তিনি বললেন, হে জাবের! আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম স্বীয় নূর হতে তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর

ঐ নূর আল্লাহর অনুমতি যেখানে যেখানে ছিল সর্বত্র ভ্রমণ করতে থাকে। তখন লওহ ছিল না, আসমান ছিল না, জমিন ছিল না, চন্দ্র ছিল না, সূর্য ছিল না, জ্বিন ছিল না, ইনছান ছিল না। তারপর আল্লাহ যখন অন্যান্য বস্তু সৃষ্টি করতে চান তখন ঐ নূর (নূরে মোহাম্মদী) কে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক অংশ হতে কলম, দ্বিতীয় অংশ হতে লওহে মাহফুজ, ৩য় খণ্ড হতে আরশ সৃষ্টি করেছেন।

অত্র হাদিস অতীব দীর্ঘ। হাদিসটি ইমাম বায়হাকী স্বীয় "দালায়েলুন্নবুয়াত" নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন এবং প্রখ্যাত ইমামগণ হাদিসটির সনদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। যথা- ইমাম আছকালানী স্বীয় "মাওয়াহেবে" ইমাম ইবনে হাজর মক্কী "আফজালুল কুরাতে" আল্লাম কাছী "মাতাবেউল মুছাররাতে" আল্লামা জুরকানী "শরহে মওয়াহেবে এবং আল্লামা শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলবী 'মুদারেজুন্নবুয়াতে" বর্ণনা করেছেন।

(২) আহমদ, বায়হাকী এবং হাকেম বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা হযরত এরবাজ বিন ছারিয়া হতে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন আমি যখন আল্লাহর নিকট সর্বশেষ নবী হিসেবে ছিলাম তখনও আদম (আঃ) স্বীয় খামিরে নিহিত ছিলেন। - (মিশকাত)

(৩) তিরমিজী শরীফে ইমাম আহমদ ও হাকেম হতে, ইমাম বোখারী (রহঃ) স্বীয় তারিখ এর মধ্যে, আল্লামা আবু নঈম 'হুলিয়া' এর মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, এবং হাকেম তাকে ছহীহ বলেছেন যে, একবার সাহাবায়ে প্রশ্ন করলেন যে, হে আল্লাহর রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আপনার জন্য নবুয়ত কখন হতে নির্ধারিত হয়েছে? তিনি বললেন, যখন আদম রুহ এবং দেহের মধ্যে বিরাজ করছিলেন।

(৪) আহকাম ইবনে কাহতান ইমাম জয়নুল আবেদীন হতে, তিনি স্বীয় পিতা হযরত আলী ইবনে আবু তালেব হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমি আদম (আঃ) এর সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহর নিকট একটি নূর ছিলাম।

(৫) আবু সুহাইল কাথান স্বীয় গ্রন্থ আমালীতে ছাহল ইবনে হামদানী হতে বর্ণনা করেন যে, আমি আবু জাফর মোহাম্মদ ইবনে আলী (অর্থাৎ) হযরত

ইমাম বাকের (রঃ) কে প্রশ্ন করলাম যে, বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তো সর্বশেষে প্রেরিত হয়েছেন, তথাপি সর্বপ্রথম কিভাবে হলেন? উত্তরে ইমাম বাকের (রঃ) বললেন আল্লাহ তা'আলা যখন আদম সন্তানদেরকে আদম (আঃ) এর পৃষ্টদেশ হতে বের করে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের দিন একত্রিত করেছেন, ঐদিন (আল্লাহর রবুবিয়াতের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করে) সর্বপ্রথম হাঁ শব্দ উচ্চারণ করেছেন বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)।

(৬) হযরত আব্বাছ (রাঃ) নবীর দরবারে আরজ করলেন আমাকে কিছু না'ত শরীফ পরিবেশন করার অনুমতি প্রদান করুন। প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন, পড়। তখন তিনি একটি না'ত শরীফ পাঠ করলেন। তম্মধ্যে দুইটি লাইন হলো-

وَاَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُوْرِكَ الْاُفُقُ

فَنَحْنُ فِي ذَالِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّوْرِ سَبِيْلُ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ.

অর্থ- হে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আপনি যখন জন্মগ্রহণ করেছেন তখন আপনার নূরের আলোকে জমিন আলোকিত হয়েছে এবং আকাশ আপনার নূর দ্বারা চমকে উঠেছে। অতঃপর আমরা ঐ নূর এবং আলোতেই রয়েছি আর ঐ আলোতে হেদায়তের পথে চলছি।

উক্ত বর্ণনাসমূহকে মৌলভী আশরাফ আলী স্বীয় পুস্তক "নশরুত্তিব" এর মধ্যে দীর্ঘ ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করেছেন। "মাওয়াহেবে লুদুনিয়া" এর মধ্যেও রওয়ায়েত গুলো বর্ণনা করেছেন।

(৭) "মাওয়াহেবে লুদুনিয়া" **১ম** খন্ডের **৫ম** পৃষ্ঠায় রয়েছে ইমাম আবু ছায়ীদ নিশাপুরী কা'ব আহবার হতে বর্ণনা করেন যে, নূরে মোহাম্মদী যখন হযরত আবদুল মোতালিব লাভ করলেন তখন তাঁর দেহ হতে মেশকের সুগন্ধি বের হত এবং নূরে মোহাম্মদী তাঁর কপালে চমকে উঠত। হযরত আবদুল মোতালিব তখন দোয়া গ্রহনীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ছিল। মক্কাবাসী তাঁকে সামনে রেখে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতেন। এবং তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি এসে যেত। এ কারণেই আবরাহার হাতীগুলো আবদুল মুতালিবকে সিজদা করেছিল।

(৮) আবু নঈম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হতে রওয়ায়েত করেন- বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ভূমিষ্ট হবার রাত্রে হযরত আমেনা (রাঃ) এর ঘর বেহেশতের হুর দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। হযরত আছিয়া এবং মরিয়মও এসেছিলেন এবং ভূমিষ্ট হবার রজনীতে হযরত আমেনা এমন নূরে মোহাম্মদী দেখেছেন যে, পৃথিবীর পূর্ব পশ্চিম আলোকিত হয়ে গেছে। এরপর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এ পৃথিবীতে তশরীফ আনেন এবং ভূমিষ্ট হতেই সিজদানত হন। -(মওয়াহেবে লুদুনিয়া **২১** পৃষ্ঠা)

সুতরাং হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নূর হওয়া বহু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এখানে নমুনা স্বরূপ কিছু পেশ করা হল মাত্র। আর কিছু হাদিস ভূমিকায়ও উল্লেখিত হয়েছে।

বিশ্বনবী "নূর" হওয়া বিষয়ে
ওলামায়ে কেরামের অভিমত

মুসলিম মিল্লাতের সর্বকালের দৃঢ় বিশ্বাস যে, বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর নূর। এতে কারো কোন প্রকার মত দ্বৈততা হয়নি। এ সম্পর্কে ওলামায়ে দ্বীনগণের মতামত নিম্নে তুলে ধরা হল-

(১) হযরত আব্বাছ (রাঃ) এর কবিতাগুলো আমি হাদিসের বর্ণনায় উল্লেখ করেছি, যেখানে তিনি নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে "নূর" বলে আখ্যায়িত করেছেন, সর্বোপরি কবিতাগুলো তিনি দরবারে রেছালতে আবৃতি করেছেন। অথচ নবী কোন প্রকার প্রতিবাদ বা বিরোধীতা করেননি।

(২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এর উক্তি আমি ভূমিকায় পেশ করেছি, যেখানে তিনি বলেছেন যে, বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর চেহারা মোবারকে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বলতা ছিল।

(৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর উক্তিও মুখবন্ধে উপস্থাপন করেছি, যাতে রয়েছে যে, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দাঁত মোবারক হতে জ্যোতি নির্গত হতো।

(৪) হযরত হিন্দ ইবনে আবু হালা এর অভিমতও সূচনায় দেয়া হয়েছে। (বলা হয়েছে যে) রসুলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর চেহারা শরীফ এতই আলোকিত ছিল যে, মনে হত যেন চৌদ্দতম রজনীর পূর্ণচন্দ্র।

(৫) হযরত শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ) "মুদারেজুন্নবুয়াত" এর ১ম খণ্ডে ১১৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন- বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর আপাদমস্তক নূর ছিল। তাই তাঁর (দঃ) ছায়া ছিল না। কেননা নূরের তো ছায়া হয় না।

(৭) মোল্লা আলী কারী "মওজুয়াতে কবির" এর ৮৬ পৃষ্ঠায় বলেন-

وَاَمَّا نُوْرُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَهُوَ فِيْ غَايَةٍ مِنَ الظُّهُوْرِ شَرْقًاوَ غَرْبًا وَاَوَّلُ مَاخَلَقَ اللّٰهُ نُوْرُهٗ وَسَمَّاهُ فِيْ كِتَابِهٖ نُوْرًا.

অর্থ- নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নূর পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিমের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিপূর্ণভাবে আলোকিত করে। এবং সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক তাঁর নূরকে সৃষ্টি করেছেন। আর একে তাঁর কিতাবের মধ্যে নূর বলে নামকরণ করেছেন।

(৮) মোল্লা আলী কারী (রঃ) একই কিতাব "মওজুয়াতের" একই স্থানে আরও বলেন-

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰي اللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَلٰي مَثَلُ نُوْرِهٖ قَلْبُ مُحَمَّدٍ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থ- আল্লাহ তা'আলা বলেন আল্লাহ আসমান এবং জমিনের নূর। আল্লাহর এই নূরের উদাহরণ হল এই যে, আল্লাহর নূর প্রিয় নবীর অন্তঃকরণ।

(৯) ইমাম বোছরী (রহঃ) "কছিদায়ে বোরদার" মধ্যে বলেন-

فَاِنَّكَ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَا كِبُهَا
يُظْهِرْنَ اَنْوَارَ هَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ

অর্থ- হে নবী আপনি মর্যাদার সূর্য আর তাঁরা (নবীগণ) তাঁর তারকা, তাঁর নূর অন্ধকারে মানুষের জন্য আলো ছড়ায়।

(১০) ইমাম জালালুদ্দিন রুমী (রহঃ) "মসনবী" শরীফের মধ্যে বলেন "আল্লাহর" নূরের ছায়াও নূর হয়ে থাকে। যিনি আল্লাহ থেকে দূরে থাকেন তার ছায়াও দূরে থাকে। আমরা যা খাই তা থেকে ময়লা নির্গত হয়, আর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যা খান তা আল্লাহর নূর হয়।

(১১) ইমাম আহমদ ইবনে মোহাম্মদ আছকলানী (রাঃ) "মওয়াহেবে লুদুনিয়া" শরীফের ১ম খণ্ডের ৯ম পৃষ্ঠায় বলেন-

قَالَ تَعَالٰي يَا اٰدَمُ اِرْفَعْ رَاسَكَ فَرَاي نُوْرَ مُحَمَّدٍ فِيْ سُرَ ادِقِ الْعَرْشِ فَقَالَ يَا رَبُّ مَا هٰذَا النُّوْرُ قَالَ هُوَ نُوْرُ نَبِيٍّ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ اِسْمُهٗ فِي السَّمَاءِ اَحْمَدُ وَفِي الْاَرْضِ مُحَمَّدٌ لَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ وَلَا خَلَقْتُ سَمَاءً وَلَا اَرْضًا.

অর্থ- আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম তোমার মাথা উঠাও, তিনি তাঁর মাথা উঠালে আরশের চৌকটের উপরে নূরে মোহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) দেখেন। তখন বললেন হে প্রভু এটা কিসের নূর? আল্লাহ বলেন এটা তোমার বংশধর হতে একজন নবীর নূর। (যিনি) আসমানে আহমদ এবং জমিনে (পৃথিবীতে) মুহাম্মদ। তিনি যদি না হতেন, আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না এবং আসমান-জমিন কিছুই সৃষ্টি করতাম না।

(১২) একই "মওয়াহেবে" ৮ম পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে-

اِنَّ اللّٰهَ لَمَّا خَلَقَ نُوْرَ نَبِيِّنَا مُحَمَّد صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهٗ اَنْ يَنْظُرَ اِلَي اَنْوَارِ الْاَنْبِيَاءِ فَغَشَّهُمْ مِنْ نُوْرِهٖ فَانْطَقَهُمْ بِهٖ فَقَالُوْايَا رَبِّ مَنْ غَشِيَنَا نُوْرُهٗ فَقَالَ اللّٰهُ هٰذَا نُوْرُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدُ اللّٰهِ اِنْ اٰمَنْتُمْ بِهٖ جَعَلْتُكُمْ اَنْبِيَاءَ.

অর্থ- আল্লাহ তা'আলা যখন বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নূরকে সৃষ্টি করে আদেশ দিলেন যে, তিনি যেন অন্যান্য নবীর নূরের দিকে থাকান, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বিশ্বনবীর নূর দ্বারা সকল নবীর নূরকে ঢেকে দিলেন এবং ঐ নূরগুলোকে আল্লাহ বাকশক্তি প্রদান করলে তাঁরা বলে উঠেন হে আমাদের প্রতিপালক! এটা কার নূর যা আমাদের নূরকে ঢেকে দিল। আল্লাহ বলেন- এটা আবদুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নূর। যদি তোমরা তাঁর উপর ঈমান আন আমি তোমাদেরকে নবী করবো।

(১৩) আল্লামা জুরকানী (রহঃ) হযরত জাবের কর্তৃক (নূর সম্পর্কিত) বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে বলেন- مِنْ نُوْرِهِ اَيْ مِنْ نُوْرٍ هُوَ ذَاتِهِ

অর্থ- আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে স্বীয় জাতিগত নূর হতে সৃষ্টি করেছেন।

(১৪) ইমাম আহমদ কছতুলানী "মওয়াহেবে লুদুনিয়ার" মধ্যে বলেন-

لَمَّا تَعَلَّقَتْ اِرَادَةُ الْحَقِّ بِاِيْجَادِ خَلْقِهِ اَبْرَزَ الْحَقِيْقَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ مِنْ اَنْوَارِ الصَّمَدِيَّةِ فِي الْحَضْرَةِ الْاَحَدِيَّةِ ثُمَّ سَلَخَ مِنْهَا الْعَوَالِمَ كُلَّهَا عُلْوَهَا وَسُفْلَهَا.

অর্থ- আল্লাহ তা'আলা যখন জগত সৃষ্টি করতে চাইলেন তখন আল্লাহর নূর হতে হাকিকতে মোহাম্মদীকে প্রকাশ কররেন এবং তা থেকে ছোট বড় সর্বপ্রকার সৃষ্টিজগতকে অস্তিত্বে আনলেন।

(১৫) "মুতালেউর মেরআত" 'শরহে দলায়েলুল খায়রাত' কিতাবে রয়েছে-

قَدْ قَالَ الْاَشْعَرِيُّ اَنَّهُ تَعَالٰي نُوْرٌ لَيْسَ كَالْاَنْوَارِ وَرُوْحُ النَّبَوِيَّةِ الْقُدْسِيَّةِ لَمْعَةٌ مِنْ نُوْرِهِ - وَالْمَلَائِكَةُ اَشْرَارُ تِلْكَ الْاَنْوَارِ - وَقَالَ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَوَّلُ مَاخَلَقَ اللهُ نُوْرِيْ وَمِنْ نُوْرِيْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَغَيْرُهُ مِمَّا فِيْ مَعْنَاهُ.

অর্থ- আবুল হাছান আশআরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা নূর কিন্তু অন্যান্য নূরের মত নয়। এবং নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর রূহ শরীফ ঐ নূরের জ্যোতি, আর ফেরেশতারা ঐ নূরের ফুল, বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমার নূর হতে সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন। এ ছাড়া আরো অনেক হাদিস একই বিষয়বস্তুর উপর রয়েছে।

(১৬) আল্লামা শাহ আবদুল গণি নাবলুছি "হাদিকায়ে নদিয়া" শরহে তরিকায়ে মোহাম্মদীয়ার মধ্যে উল্লেখ করেন-

قَدْ خَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ نُوْرِهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَمَا وَرَدَ بِهِ الْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ.

অর্থ- প্রত্যেক বস্তু নবীর নূর হতে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা বিশুদ্ধ হাদিস সমূহে উল্লেখিত রয়েছে।

দেওবন্দী আলেমদের মতামত

দেওবন্দীদের পেশোয়া মৌলভী আশরাফ আলী থানবী স্বীয় পুস্তক "নশরুত্বীব" এর বিষয়বস্তু এভাবেই শুরু করেন-

প্রথমত পরিচ্ছেদ নূরে মোহাম্মদীর বর্ণনা সম্পর্কে। অত্র পরিচ্ছেদে নূর সম্পর্কিত ঐ হাদিসগুলো পেশ করেছেন যা আমরা হাদিস পর্বে উল্লেখ করেছি। এ প্রসঙ্গে বলেন উক্ত হাদিস দ্বারা নূরে মোহাম্মদী প্রথম সৃষ্ট বস্তু হওয়া মৌলিকভাবে প্রথম হিসেবে প্রমাণিত। কেননা যে সমস্ত বস্তু প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে মর্মে হাদিসে বর্ণিত রয়েছে, ঐ বস্তুগুলো যে নূরে মোহাম্মদীর পরেই সৃষ্টি করা হয়েছে তা অত্র হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এতে উক্ত মৌলভী দুইটি বস্তুকে স্বীকার করেছেন, প্রথমতঃ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নূর হওয়া, দ্বিতীয়তঃ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নূর সমস্ত বস্তুর পূর্বে হওয়া এবং তা হতে সমস্ত বস্তু সৃষ্টি হওয়া।

মৌলভী আশরাফ আলী স্বীয় "ছলজুচ্ছুদুর" নামক কিতাবে উল্লেখ করেন "আমার অদ্বিতীয় আলোকছটার সম্মুখে তুমি উৎসর্গ হয়ে যাও, নয়তো আমার নূরের সম্মুখে তুমি লাঞ্চিত হবে। তিনি একই কিতাবের অন্যত্র বলেন-

نبي خود نوراورقران ملانور

نه هويهر ملكے كيون نورعلي نور

অনুবাদ ঃ নবী স্বয়ং নূর এবং কোরআনও নূর, সুতরাং উভয়টি মিলে নূরের উপর নূর হবে না কেন?

শাহ আবদুর রহিম (অর্থাৎ শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দেছে দেহলভীর পিতা স্বীয় কিতাব "আনফাসে রহিমিয়্যাহ" তে বলেন ফরশ হতে আরশ পর্যন্ত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন এবং নিম্ন মর্যাদা সম্পন্ন সমস্ত ফেরেস্তা হাকিকতে মোহাম্মদীয়া হতে সৃষ্ট। আল্লাহ সর্বপ্রথম হুযুরের নূরকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন, যদি তাঁকে

সৃষ্টি না করতাম, তাহলে আমি আসমান সমূহকেও সৃষ্টি করতাম না। যদি তিনি না হতেন তাহলে আমি স্বীয় প্রভূর প্রভূত্ব (রবুবিয়াত) প্রকাশ করতাম না।

দেওবন্দী ওহাবীদের ইমাম মৌলভী ইসমাইল দেহলভী স্বীয় কিতাব "মসনবে ইমামত" এ বলেন "হ্যাঁ যে ব্যক্তি অন্ধ হবে সে তো হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর উজ্জ্বল নূর স্পর্কে অনবহিত থাকবেই।

তিনি একই কিতাবের অন্যত্র লিখেন-

কিন্তু বরকত নাজিল হওয়া সম্পর্কে বক্তব্য হলো এই যে, সম্মানিত নবীগণের অস্তিত্ব পৃথিবীতে আলোদানকারী সূর্যের ন্যায়। যখন ঐ সূর্যের আলো দুনিয়ার মধ্যে বিচ্ছুরিত হয় তখন রাতের অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়।

মৌলভী হোসাইন আহমদ স্বীয় দলভুক্ত ওলামাদের এবং নিজের অভিমত স্বীয় কিতাব "আশ শুবহাতুচ্ছাবির" এর ৫০ পৃষ্ঠায় এভাবে ব্যক্ত করেছেন- আমাদের সম্মানিত মুরুব্বীগণের উক্তি ও চিন্তাধারা শুনুন, তাঁরা সকলেই হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র স্বত্বাকে সদা সর্বদা এবং সর্বকালের সর্বযুগের জন্য আল্লাহর করুণা লাভের মাধ্যম এবং অশেষ রহমতের আধার হিসাবে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে আছেন। তাদের বিশ্বাস হল এই যে, আদি হতে যে সমস্ত দয়া এবং করুণা সৃষ্টি জগতের উপর হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, তা জাগতিক হোক কিংবা অন্য কোন প্রকারের হোক, সবগুলোর মধ্যে এই স্বত্বার অবদান এমনভাবে রয়েছে, যেমনিভাবে সূর্য হতে প্রথমে চন্দ্র আলো লাভ করেছে এবং ঐ চন্দ্র হতে অগণিত আয়নাসমূহ। মোটকথা, বিশ্ব ও বিশ্ববাসীর সমস্ত পূর্ণতার মাধ্যম হলেন হাকিকতে মোহাম্মদী। এ কারণেই আল্লাহ বলেন- لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ এবং নবীর বাণী أَنَا نَبِيُّ الْأَنْبِيَاءِ এবং أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُورِيْ

দেওবন্দীদের অন্যতম পেশোয়া মৌলভী রশিদ আহমদ স্বীয় কিতাব "এমদাদুছ ছুলুক" এর ৮৫ পৃষ্ঠায় বলেন-

"এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হাবিব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে বলেন যে, তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে 'নূর' এবং স্পষ্ট কিতাব এসেছে। 'নূর' এর অর্থ আল্লাহর প্রিয় হাবিব এর পবিত্র স্বত্বা,

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন যে, হে নবী, আমি আপনাকে সাক্ষী, সু-সংবাদদাতা, ভয় প্রদর্শনকারী, আল্লাহর পথে আহবানকারী জ্বলন্ত সূর্য হিসেবে প্রেরণ করেছি। 'মুনীর' বলা হয় উজ্জ্বলকারী এবং আলো দাতাকে।

বর্ণিত বক্তব্যে মৌলভী রশিদ আহমদ তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন (ক) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর নূর (খ) قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ এর মধ্যে নূরের অর্থ বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ও (গ) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) শুধু নূরই নন বরং মুনীর (অর্থাৎ আলোকিতকারী বা আলোদানকারীও বটে। যেহেতু তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে আলোকিত করেন। প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এমন একটি সূর্য বা রাত্রে চন্দ্রকে আলোকিত করে এবং দিনে বালুকণা গুলোকে চমকে দেয়। এখন কোন দেওবন্দীর উপরোক্ত বিষয়ত্রয়কে অস্বীকার করার জো নেই।

মৌলভী রশিদ আহমদ নিজ কিতাব "এমদাদুচ্ছুলুক এর ৮৬ পৃষ্ঠায় বলেন- নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন "আল্লাহ পাক আমাকে স্বীয় নুর হতে সৃষ্টি করেছেন এবং মুসলমানদরকে আমার নূর হতে সৃষ্টি করেছেন।

মৌলভী রশিদ আহমদ একই কিতাবের ৮৬ পৃষ্ঠায় বলেন, রসুলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আদম (আঃ) এর সন্তান কিন্তু তিনি নিজকে এতই পবিত্র করেছেন যে, তিনি অকৃত্রিম নূর হয়ে গেছেন এবং আল্লাহ তাঁকে নূর বলেছেন। এই হাদিসটি মুতাওয়াতের সনদ দ্বারা প্রমাণিত যে, বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া ছিল না, অথচ নূর ব্যতীত সমস্ত দেহের ছায়া বিদ্যমান।

উক্ত বক্তব্যে মৌলভী সাহের দুইটি বস্তু স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রথমতঃ বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নূর, আল্লাহ তাঁকে নূর বলেছেন। দ্বিতীয়তঃ প্রিয় নবীর দেহই মোবারকের ছায়া ছিল না। অর্থাৎ তাঁর নুরানীয়াত বেশ কতেক পন্থায় অনুভূত হয়েছে। হুজুর (দঃ) নূর হওয়ার উপর অনেক প্রমাণাদি পেশ করা যায়। তবে আমি এখানেই ইতি টানছি। যেহেতু যাঁরা মানতে চান তাঁদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট আর বিরোধীতাকারীদের জন্য পুরো কিতাবই নিষ্ফল।

বিবেকগ্রাহ্য (আকলী) প্রমাণাদি

বিবেকও এ কথা স্বীকার করে যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর শরীর মোবারকের প্রতিটি অংশই নূর, সর্বোপরি তাঁর সব অবস্থাই নূর। প্রমাণাদি নিম্নে বর্ণিত হল-

(১) নূর সেটাই যা নিজে প্রকাশিত এবং অন্যকেও প্রকাশিত করে। বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এমন প্রকাশ্য যে, তাঁকে জল, স্থল, গাছ, পাথর, আকাশের তারকারাজি জামিনের প্রতিটি বালুকণা ভালভাবেই জানে। মানুষ তাঁকে জানে, জীব জগত তাঁকে জেনে, কঙ্কর তাঁর কলেমা পড়ে, পাথর তাঁর সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়। এক কথায় তিনি এতই প্রকাশ্য যে, কারো নিকট থেকে আড়াল নন। সাথে সাথে অন্যদেরকে এমনভাবে আলোকিত করে দিয়েছেন যে, তাঁর সাথে যার সম্পর্ক হয়েছে যে আলোকিত হয়ে গেছে। মদিনার গলি পথগুলো তাঁর দ্বারাই ঝলমল করে উঠেছে, মক্কার বাজার সমূহ কা'বা শরীফের কারুকার্যগুলো তাঁর দ্বারাই চমক পেয়েছে। তাঁর দ্বারাই হযরত হালিমা (রাঃ) এর গুনকীর্তন আজ বিশ্বব্যাপী ব্যাপকতা লাভ করেছে, তাঁর দ্বারাই নবী পরিবারের গুণাবলী ও মর্যাদা সম্বলিত খোতবা পাঠ করা হচ্ছে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীগণের মধ্যে যাঁকে আমাদের নবী প্রকাশ করেছেন তিনি প্রকাশিত হয়েছে, অন্যান্য নবীগণ অদ্যাবধি গোপন রয়ে গেছেন, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার মৌলিক এবং গুণগত স্বত্ত্বা আমাদের নিকট নবীর মাধ্যমেই পৌঁছেছে। অথচ আমাদের বিবেক ঐ স্তর পর্যন্ত পৌঁছার উপযুক্ত এবং সম্ভবপর ছিল না। অর্থাৎ নূরের পরিপূর্ণতা বিশ্বনবীর মধ্যে পুরোপুরিভাবে বিদ্যমান, তাই তিনি পরিপূর্ণ নূর।

(২) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দোয়া নিশ্চিত গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰي

অর্থাৎ- আল্লাহ অনতিবিলম্বে এতগুলো দান করবেন যে, আপনি তুষ্ট হয়ে যাবেন। আর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) দোয়া করতেন যে, اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ نُوْرًا অর্থাৎ হে আল্লাহ, আপনি আমাকে নূর করে দিন। এবার বলুন, নবীর উক্ত আরাধনা কবুল হয়েছে কি না? যদি হয়ে থাকে তাহলে তিনি তো নিঃসন্দেহে নূর।

(৩) মানুষের দেহ মাটির তৈরী আর রূহ নূরের তৈরী। আল্লাহ বলেন-

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ

অর্থাৎ হে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আপনি বলুন রূহ আমার আদেশ হতে সৃষ্ট। অর্থাৎ রূহ আদেশ জগতের একটি সৃষ্ট বস্তু আর ঐ আদেশ জগত হলো নূর। আল্লাহর প্রিয়তম বান্দাদের আত্মার নূরানীয়াত এতই তীব্র ও প্রকট হয় যে, তাদের দেহও আলোকিত হয়ে যায়। এ কারণে কোন কোন আউলিয়া কেরামের দেহ তরবারী পর্যন্ত আকর্ষণ করতে পারে না। বরং এদিক সেদিক চলে যায়। কোন কোন আউলিয়া কেরাম কয়েক মাস ধরে কোন প্রকার পানাহার করেন না।

"ফাতোয়ায়ে হাদিছিয়া" এর "আততাছাউফ" নামক অধ্যায়ে আল্লামা ইবনে হাজার হযরত মুহীউদ্দিন ইবনে আরবী (রঃ) সম্পর্কে বলেন-

حَتّٰي اَنَّهُ مَكَثَ عَلٰي ثَلٰثَةِ اَشْهُرٍ عَلٰي وَضُوْءٍ وَاحِدٍ

অর্থাৎ- তিনি (মুহীউদ্দিন ইবনে আরবী) এক অজুর উপর তিন মাস অতিবাহিত করেন। বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এই দলের সর্দার এবং পেশোয়া, তার রূহ মোবারকের নূরানীয়াত তাঁর দেহ মোবারকের উপর এতই প্রবল যে, তাঁর দেহ মোবারকও নূরানী হয়ে গেছে।

(৪) রওয়ায়েত সমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দেহ মোবারকে ছায়া ছিল না। (দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ) অথচ ভারী বস্তুর ছায়া থাকে। (তথাপি হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দেহ মোবারকের ছায়া নেই) প্রমাণিত হল যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নূর, যেহেতু তাঁর দেহ শরীফে স্থূলতার লেশমাত্রও ছিল না।

(৫) নবীয়ে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মেরাজ রজনীতে অগ্নিকুন্ডের পাশে জামহারীর (এমন স্থান যা অতীব ঠাণ্ডা) নিকট দিয়ে গমন করেছেন এবং এমন স্থানে পৌঁছেছেন, যেখানে কোন স্থান নেই অর্থাৎ তিনি লা মকানে সমীসীন হয়েছেন। অথচ এ কথা সুস্পষ্ট যে, কোন দেহ আগুন থেকে রক্ষা পেতে পারে না এবং প্রতিটি দেহের জন্য স্থানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সুতরাং স্পষ্টতঃই প্রমানিত হল যে, উক্ত (মেরাজ) রজনীতে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নূরানীয়তের মধ্যে আবগাহন করেছেন।

(৬) কোন মানুষ বায়ু ব্যতীত জীবিত থাকতে পারে না। আর মেরাজ রজনীতে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যেখানে তশরীফ নিয়ে গেছেন সেখানে বায়ু লেশমাত্রও ছিল না। এতদসত্ত্বেও তাঁর জীবিত থাকা এ কথাই প্রমানিত করে যে, তিনি নূর।

(৭) যদি মানুষের বক্ষে সামান্যতম আঘাতও লাগে তাতে মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু ফেরেস্তারা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কলব মোবারককে বক্ষ মোবারক হতে নির্গত করে তাতে নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। তবুও তিনি জীবিত ছিলেন। বুঝা গেল যে, তিনি নূর এবং তাঁর জীবন নূরানী।

(৮) অবিরাম রোজা (সওমে বেসাল) পালনের সময় তিনি পর পর কয়েক দিন পর্যন্ত ইফতার ব্যতিরেকেই রোজা পালন করতেন। এতদসত্ত্বেও ক্ষুধা পিপাসা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। যদি তাঁর জীবন আমাদের মতো নিছক দেহ সর্বস্ব হত, তাহলে পানাহার হতে এতটুকু বিমুখ হতে পারতেন না। আজও অনেক আউলিয়ায়ে কেরাম প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নূর দিবানিশি আপন চোখে অবলোকন করে থাকেন।

এ প্রসঙ্গে মওলানা আবদুর রহমান জামী (রাহঃ) এর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "তাঁর চেহারা মোবারক আমার চোখের সামনে দিবানিশি দৃশ্যমান।"

কোন কোন আল্লাহর ওলী বলেন "যদি এক মুহুর্তের জন্যও তাঁকে দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হই, তখন নিজকে "ধর্ম ত্যাগী" বলে ফতোয়া দিই"। এমন অনেক বস্তু রয়েছে যা আমাদের দৃষ্টির নাগালের বাইরে হওয়া সত্ত্বেও অন্যের মুখ থেকে শুনে মেনে নিই। আমাদের উচিত যে, অনুরূপভাবে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নূরকে আমাদের দুর্বলতার কারণে আমরা না দেখা সত্ত্বেও অন্যদের নিকট থেকে শুনে তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা।

(৯) প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মিরাজ রজনীতে হাজার বৎসরের ভ্রমণ পথ এক মুহুর্তে অতিক্রম করেছেন। এত স্বল্প সময়ে এতটুকু

পথ কোন ভারী দেহ বিশিষ্ট ব্যক্তি অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না। এতেও বুঝা যায় যে তিনি নূর। যেভাবে দৃষ্টিশক্তি এবং চিন্তাশক্তি মুহুর্তের মধ্যে সুদুর পথ অতিক্রম করতে পারে অনুরূপ প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এতটুকু পথ এক মুহুর্তে অতিক্রম করেছেন।

(১০) প্রিয় নবীর প্রশংসায় পবিত্র কোরান বলেন-

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

অর্থাৎ তোমাদের কষ্ট তাঁর উপর বোঝা স্বরূপ এবং অসহনীয়। স্পসটতঃই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তার দেহের প্রতিটি অংশের ব্যথায় ব্যথিত হয়, যেমন পায়ে আঘাত লাগলে প্রাণে অনুভূত হয়, মাথায় ব্যথা পেলে রূহে অনুভব হয় অনুরূপ প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এমন নূর যে, নিজের প্রত্যেক উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত।

(১১) স্বাশ্বত নিয়ম হল যে, একাধিক সংখ্যাগুলোর গণনা এক থেকেই আরম্ভ হয় এবং অধিক সংখ্যাগুলো এক থেকেই গঠিত হয়। বরং এক সংখ্যাটি অধিক সংখ্যার মুলবিন্দু হয়। দেখুন, আকাশের অসংখ্য তারকারাশি একটি মাত্র সূর্য হতে আলো লাভ করে। গাছের সমস্ত পাতা, শাখা-প্রশাখা, ফল-ফুল একটি মাত্র শিকড়ের উপরই নির্ভর এবং একটি মাত্র শিকড় হতেই আহার সংগ্রহ করে। মানব জাতির দৈহিক সূচনা হযরত আদম (আঃ) হতে শুরু। দেহের প্রতিটি অংগ একটি মাত্র আত্মার দ্বারাই জীবিত থাকে। মোট কথা প্রত্যেক অধিক সংখ্যার মধ্যে "এক" এর অবদান রয়েছে, সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুর মূল কেন্দ্রও একটি হওয়া বাঞ্চনীয় এবং এক হতেই সবকিছুর অস্তিত্ব টিকে থাকা স্বাভাবিক। আর ঐ মূল কেন্দ্র বিন্দুর নাম হাকিকতে মোহাম্মদীয়া এবং নূরে মোহাম্মদী। তা না হলে বলুন এ সবকিছু কোন এককের শাখা? এবং কোন একক এখানে ক্রিয়াশীল? মোট কথা এটা স্বতঃ সিদ্ধ যে, হাকিকতে মোহাম্মদী সৃষ্টির মুল এবং সমগ্র সৃষ্টি তার থেকেই আলো গ্রহণ করেছে এবং করতে থাকবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

“নূর” হওয়া সম্পর্কিত বিষয়ের উপর উত্থাপিত অভিযোগ ও তার উত্তর

১নং অভিযোগ ঃ যদি নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর নূর হন তাহলে আল্লাহর নূর খন্ড খন্ড হয়ে গেছে এবং তাঁর মধ্যে আল্লাহর অংশ বিশেষ প্রবেশ করেছে। অথচ এ ধরনের বিশ্বাস খ্রিষ্টানদের আক্বিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেহেতু খ্রীষ্টানরা ঈসা (আঃ) এর মধ্যে আল্লাহর অংশ বিশেষের উপস্থিতি ছিল বরে বিশ্বাস করত।

উত্তর ঃ অভিযোগ উত্থাপনের কারণ এই যে, অভিযোগ উত্থাপনকারী নিজেই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেনি। প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর নূর হওয়ার অর্থ শুধু এটাই যে, প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বিনা মাধ্যমে আল্লাহর নূর আহরণকারী আর সমগ্র সৃষ্টি প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর মাধ্যমে প্রতিপালকের নূর অর্জন করেছে। যেমন সূর্যের সামনে যদি আয়না থাকে তখন সূর্যের প্রতিচ্ছবি আয়নাটিকে আলোকিত করে দেয়। এখন ঐ আয়নাটিকে অন্যান্য আয়নার দিকে ফিরিয়ে তা ঐ আয়নাগুলোকে আলোকিত করে দেবে। তখন প্রথম আয়নাটিকে সূর্যের অংশ বিশেষও বলা যাবে না এবং মুলও বলা যাবে না বরং বিনা মাধ্যম তা সূর্য হতে আলো অর্জন করেছে মাত্র আর অন্যন্য আয়না সমূহ ঐ আয়না হতেই আলো লাভ করেছে। সম্পর্কটি এ ধরণের হতে পারে যে, কোরান শরীফে আল্লাহ তা'আলা সালেহ (আঃ) এর উটকে “নাকাতুল্লাহ” অর্থাৎ “আল্লাহর উট” হযরত ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর রূহ” বলেছেন। যেহেতু তিনি পিতা মাতার মাধ্যম ব্যতীতই সৃষ্ট। অনুরূপ প্রিয়নবীকেও “নূরুল্লাহ” বলা হয়।

২নং অভিযোগ ঃ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নূর নন। যেহেতু আল্লাহ তা'আরা বলেছেন- قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ আমি তোমাদের মত বশর। তিনি যেহেতু বশর সেহেতু “নূর” নন। “বশরিয়াত” এবং “নূরানিয়াত” একত্রিত হতে পারে না।

উত্তর ঃ প্রিয়নবী “নূর” এবং “বশর” উভয়টি। অর্থাৎ তিনি নূরানী বশর। তাঁর হাকিকত নূর এবং আকৃতি বশর। যেমন- আল্লাহ তা'আলা হযরত জিব্রাইল (আঃ) সম্পর্কে বলেন-

فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

অর্থাৎ- অতঃপর আমি তার (হযরত মরিয়মের) নিকট আমার রূহ (হযরত জিব্রাইল) কে পাঠিয়েছি, সে তার (মরিয়মের) সামনে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে রূপ ধারণ করেছে। হযরত জিব্রাইল (আঃ) একজন ফেরেশতা, তিনি নূর। অথচ হযরত মরিয়মের নিকট মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তখন তাঁর মানবিক আকৃতি ধারণ করার কারণে নূরানিয়াত চলে যায়নি। সাহাবাগণ হযরত জিব্রাইলকে মানুষের আকৃতিতে দেখেছেন। কালো চুলগুচ্ছ, সাদা পোষাক, চোখ, নাসিকা, কান সবই ছিল অথচ তিনি নূর। অনুরূপ হযরত ইব্রাহীম, লুত, দাউদ আলাইহিমুছ ছালাম এর খেদমতের জন্য ফেরেস্তারা মানুষের আকৃতি ধারণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُوْنَ.

অর্থাৎ- তোমার নিকট কি ইব্রাহীম (আঃ) এর অতিথিদের সংবাদ পৌঁছেছে? তারা যখন হযরত ইব্রাহীমের নিকট প্রবেশ করল বলল ছালাম, তিনি বললেন- এ সালাম অপরিচিত সম্প্রদায় হতে।

هَلْ اَتَاكَ نَبَؤُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابَ اِذْدَخَلُوْا عَلٰى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ.

অর্থাৎ- তোমার নিকট কি ঝগড়ার সংবাদ পৌঁছেছে? যখন তারা মেহরাব লাফিয়ে দাউদ (আঃ) এর নিকট প্রবেশ করল, এতে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। তারা বলল- ভয় করবেন না আমরা এমন দুই দল যারা পরস্পরের উপর সীমালংঘন করেছে। (সূরা “ছোয়াদ”-২৩ পারা)

وَلَمَّا اَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوْا لَاتَخَفْ وَلَاتَحْزَنْ اِنَّا مُنَجُّوْكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِيْنَ.

অর্থাৎ- আর যখন আমার প্রতিনিধিরা (ফেরেস্তা) লুত (আঃ) এর নিকট আসল, তাঁর নিকট খারাপ লাগল এবং তাদের কারণে তাঁর অন্তকরণ সংকুচিত হয়ে গেছে। তারা বলল- ভয় এবং চিন্তা করবেন না। আমরা আপনাকে মুক্তি দেব তবে আপনার স্ত্রীকে তিনি অবশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে থাকবেন। (সূরা "আনকাবুত"- ২০ পারা)

বর্ণিত আয়াত সমূহ দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, ফেরেস্তারা আম্বিয়ায়ে কেরামগণের নিকট মানুষের আকৃতিতে উপস্থিত হত। অথচ তখন তারা নূরানী ছিল। মোটকথা হল "নূরানীয়াত" ও "বশরিয়াত" পরস্পরের পরিপন্থী নয়।

৩নং অভিযোগ ঃ বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যদি নূর হতেন এবং প্রত্যেক স্থানে হাজের নাজের হতেন, তাহলে প্রত্যেকটি স্থান আলোকিত হওয়া এবং কোন স্থানই অন্ধকার না থাকা উচিৎ ছিল। এতে বুঝা যাচ্ছে হয়তো তিনি নূর নন অথবা সর্বত্র বিরাজমান নন।

উত্তর ঃ উক্ত প্রশ্নের দুটি উত্তর হতে পারে। প্রথমটি ইলজামী দ্বিতীয়টি বিশ্লেষণমূলক। ইলজামী হল এই যে, আল্লাহ তা'আলার নূর এবং সদা সর্বদা আমাদের সাথে রয়েছেন অথচ তা দ্বারা সর্বত্র আলোকিত হচ্ছে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন-

(১) اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (আল্লাহ আসমান জীমনের নূর)। - সূরা "নূর" ১৮ পারা।

(২) وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ (তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সাথে আছেন।) - সূরা 'ওয়াকেয়া' ১৭ পারা।

(৩) نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ (তোমাদের চেয়ে ও অধিক নিকটে আমি আছি। অথচ তোমরা তা দেখ না।) - সূরা ওয়াকেয়া ২৭ পারা।

(৪) نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ (আমি তার শাহী রগ অপেক্ষা অধিক নিকটে)।

(৫) اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্য্যধারণকারীদের সাথে আছে।) - সূরা বাকারা, ২য় পারা।

তাছাড়া কোরান শরীফও নূর এবং প্রত্যেকের ঘরে বিদ্যমান অথচ আলোকিত হয় না। ফেরেস্তা নূর আমাদের সাথে থাকে কিন্তু ইহার আলো বিচ্ছুরিত হয় না। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন-

(৬) وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا (আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট নূর অবতীর্ণ করেছি)। - সূরা নিছা, ৬ষ্ঠ পারা।

(৭) قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ (বলে দিন, তোমাদেরকে এ মৃত্যুর ফেরেস্তা মৃত্যুবরণ করাবেন যাঁকে তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে)। - সূরা সিজদা ২১ পারা।

এবার বলুন, আল্লাহ তা'আলা হয়তো আমাদের সাথে নেই অথবা নূর নয়।

বিশ্লেষণমূলক উত্তর হলো এই যে, নূর দুই প্রকার। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা দৃশ্যমান এবং ইন্দ্রিয় অগ্রাহ্য বা অদৃশ্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নূর অনুভব হওয়া আবশ্যক, তবে ইন্দ্রিয় অগ্রাহ্য নূর দেখার জন্য খোদা প্রদত্ত শক্তিও প্রয়োজন। অন্ধ ব্যক্তি যদি সূর্য না দেখে তার উচিৎ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন মানুষের নিকট সে সম্পর্কে জেনে শুনে তা বিশ্বাস করা। অনুরূপ খোদা প্রদত্ত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন অলিগণ যাঁরা নূরে মোহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) দেখেন এবং অনুভব করতে পারেন তাঁদের নিকট থেকে জেনে শুনে এবং কোরানকে বিশ্বাস করতঃ প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে নূর হিসেবে মেনে নেয়া উচিত।

৪নং অভিযোগ ঃ বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যদি নূর হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি পানাহার করেন কেন? তাঁর সন্তান সন্ততি হয় কেন? এবং সমস্ত সৈয়দ নূর হওয়া উচিৎ ছিল কারণ মানুষের সন্তান মানুষ, ঘোড়ার সন্তান ঘোড়া, বাঘের সন্তান বাঘ হয়ে থাকে। সুতরাং নূর এর বংশধরও নূর হওয়া চাই।

উত্তর ঃ কোরআনের কোন আয়াতে বা কোন হাদিস গ্রন্থে এ কথা নেই যে, নূর এর সন্তান হয় না। যদি থাকে তাহলে উপস্থাপন করুন। ফেরেশতাদের সন্তান সন্ততি এ কারণেই নেই যে, যেহেতু তারা ফেরেশতা। ফেরেশতার সন্তান সন্ততি হয় না। আমরা প্রিয় নবীকে নূর হিসেবে মানি, কোন ফেরেশতা হিসেবে নয়। আপনাদের এ সমস্ত কথাবার্তা নিতান্তই অনর্থক। এ ধরণের যাবতীয় প্রশ্ন ঐ সময়ই উথাপন যোগ্য হতে পারে যখন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বশর হওয়াকে অস্বীকার করা হয়। অথচ প্রিয় নবী নূর এবং বশর উভয়টি। আর এ সমস্ত গুণাবলী বস্তুতঃ মানুষেরই, নূরের নয়। ঈসা (আঃ) আসমানের উপর হাজার হাজার বৎসর ধরে অবস্থান করছেন। পানাহার গ্রহণ করা, ঘুমানো এবং সন্তান সন্ততি জন্ম ইত্যাদি হতে পুতঃ পবিত্র। কেননা সেখানে নূরানীয়াতের প্রাধান্য রয়েছে। আর যখন তিনি পৃথিবীতে আগমন করবেন তখন পুণরায় পানাহার বিবাহসহ অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করবেন। যেহেতু তখন বশরিয়াতের প্রাধান্য বিদ্যমান থাকবে। বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মেরাজ রজনীতে হাজার হাজার বৎসর রাস্তা অতিক্রম করেছেন। তখন নূরানীয়াতের প্রাধান্য ছিল। তাই পানাহারের প্রয়োজনীয়তা রাখা হয়নি। যখন তিনি 'ছওমে বেছাল' রাখতেন তখন বিনা ইফতারে লাগাতার রোজা রাখতেন। অথচ কোন প্রকার ক্ষুধা অনুভব হত না। কিন্তু অন্যান্য সময়ে যদি আহারাদি গ্রহণ না করতেন তখন ক্ষুধার প্রভাব তাঁর চেহারা মোবারকে প্রতিভাত হতো। কারণ রোজা পালনকালে নূরানীয়াতের প্রাধান্য থাকে আর অন্যান্য সময়ে বশরিয়াতের প্রাধান্য বিরাজ করে। 'হারুত' 'মারুত' উভয়ই ফেরেশতা, তারা নূর কিন্তু যখন তাদের মানুষের পোষাক পরিধান করিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হলো তখন তাদের পানাহারও গ্রহণ সহবাস করার শক্তি ঐ মানবীয় পোষাকের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে। আজরাঈল (আঃ) হযরত মুছা (আঃ) এর দরবারে মানবীয় আকৃতি ধারণ করে এসেছে। তাঁকে হযরত মুছা (আঃ) চড় মারতেই তাঁর চক্ষু খসে পড়ল। তাঁর এ চক্ষু খসেপড়া মানবীয় কারণেই হয়েছে। মুছা (আঃ) এর লাঠি মোবারক যখন সর্প হয়ে যেত তখন পানাহার করত। সর্পের এ পানাহার গ্রহণ তার পারিপার্শ্বিক আকৃতি ধারণ করার কারণেই হয়েছে। মহান প্রভু বলেন-

وَاَوْحَيْنَا اِلٰي مُوْسٰي اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَايَأْفِكُوْنَ.

(আর আমি মুছাকে প্রত্যাদেশ দিয়েছি যে, তোমার স্বীয় লাঠি ফেলে দাও। তখন সে যাই পেয়েছে তা অমনি গলঃধকরণ করল।) - (আ'রাফ ৯ম পারা)

وَاَلْقِ مَافِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَاصَنَعُوْا

(হে মুছা স্বীয় হস্তের মধ্যে যা রয়েছে তা ফেলে দাও, তাদের (যাদুকরদের) তৈরী সমস্ত বস্তু খেয়ে ফেলবে। - (ছুরা তোয়াহা ১৬তম পারা)

বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বশরিয়াতের মধ্যে হযরত আদম (আঃ) এর বংশধর কিন্তু নূরানীয়াতের মধ্যে তিনি হযরত আদম (আঃ) এর সৃষ্টির মূল উৎস। নূরের মধ্যে জন্মদান এবং বংশ বিস্তার করার উপাদান নেই। ঈমান নূর। মুমীনগণ নূরানী। আলেমগণ নূরানী। তথাপি মো'মেনদের সন্তান কাফের হয়, আলেমের পুত্র জাহেল হয়, এমন কি নবীর সন্তানও কাফের হয়ে থাকে। বেহেশতবাসীগণ নূরানী হবেন। হুরগণ নূর কিন্তু হাদীছ শরীফে রয়েছে কতেক বেহেশতবাসী সন্তান কামনা করবেন এবং তাদের সন্তানও হবে।

এবার বলুন, যদি নূরের সন্তান-সন্ততি না হয়ে থাকে, তাহলে এই বেহেশতবাসীগণ কোথা হতে সন্তান লাভ করবে?

৫নং অভিযোগ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী-

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُبِيْنٌ.

এ আয়াতের মধ্যে واو অক্ষরটিকে বিশ্লেষণাত্মক অব্যয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এবং 'নূর' দ্বারা কোরানকে বুঝানো হয়েছে, বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে বুঝানো হয়নি। বরং 'নূর' দ্বারা ঐ গ্রন্থকে বুঝানো হয়েছে যাকে কিতাবে মুবীন বা প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট গ্রন্থ বলা হয়েছে।

উত্তর ঃ বিশ্লেষক মহল, মুফাচ্ছেরীনে কেরামের মতানুযায়ী উক্ত আয়াতে নূর দ্বারা বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লামা জালাল উদ্দিন ছয়ুতী, তফসীরে খাজেন, মাদারেক, ইবনে আব্বাস, ছাবী প্রভৃতি তফসীর গ্রন্থ সমূহে বিদ্যমান। তাছাড়া অত্র আয়াতের প্রারম্ভিকায়ও প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর আলোচনা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِمَّا تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ - قَدْجَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُبِيْنٌ.

অর্থাৎ- হে আহলে কিতাব! (ইহুদী-নাসারা) নিশ্চয় তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসেছেন। যিনি তোমাদের নিকট কিতাবের এমন অনেক বিষয়সমূহ প্রকাশ করবেন যা তোমরা গোপন রেখেছিলে এবং অনেককে ক্ষমা

করবেন। অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এবং স্পষ্ট কিতাব এসেছে। (ছুরা মায়েদা ৬ পারা)

বর্ণিত আয়াতটি একথাই বলে দিল যে, আয়াতে 'নূর' দ্বারা ঐ বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কেই বুঝানো হয়েছে যাঁর আলোচনা করা হলো।

তাছাড়া আয়াতে واو অক্ষরটিকে 'বিশ্লেষণাত্মক অব্যয়' হিসেবে ব্যবহার করা মজাযি বা রূপক অর্থেই হয়ে থাকে। অথচ বিনা প্রয়োজনে মাজাযি বা রূপক অর্থ গ্রহণ না করা চাই। কেননা অব্যয় তার পরবর্তী শব্দকে পূর্ববর্তী শব্দ হতে বিপরীত করে দেয়। সুতরাং নূর এবং কিতাব উভয়টি পরস্পর হতে ভিন্ন হওয়া বুঝা যায়। তদুপরি আরবী ব্যাকরণ মতে আতফে তফসীর বা বিশ্লেষণাত্মক অব্যয়ে কিতাবে মুবীন নতুন। আর প্রথম অবস্থায় কিতাবে মুবীন' হলো ভিত্তি। অথচ ভিত্তি নতুন অপেক্ষা উত্তম। অর্থাৎ এটাই উত্তম যে, দ্বিতীয় অংশ কিছু নতুন কথা বর্ণনা করবে। এটা নয় যে, প্রথম কথাকে পুণরায় বলে দেবে। তাছাড়াও নিম্নোক্ত আয়াতটি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যাকারী।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا وَّدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا.

বর্ণিত আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে উজ্জ্বল সূর্য বলে আখ্যায়িত করল। আর কোরানের একটি আয়াতের তফসীর আর একটি আয়াত দ্বারা করাটাই শ্রেয়। তাছাড়া উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা ঐ হাদিসটিই, যা মৌলভী আশরাফ আলী থানভী স্বীয় কিতাব 'নশরুত্তীব' এর মধ্যে আবদুর রজ্জাকের সূত্রে হজরত জাবের হতে বর্ণিত সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এরশাদ হয়েছে, হে জাবের আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর আগে তোমার নবীর নূরকে স্বীয় নূর হতে সৃষ্টি করেছেন।

আর কোরানের ব্যাখ্যা যদি স্বয়ং ছাহেবে কোরান বর্ণনা করে দেন তাহলে সেটাই তো উত্তম কিতাব। তাছাড়া কিতাবের জন্য তো নূর চাই। যাতে সেটা পড়তে পারা যায়। কোরানের বাক্যসমূহ তেলাওয়াত করার জন্য যেমন আলোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তেমনি কোরানের গুঢ় রহস্য সমূহ উদঘাটন করার জন্যও আধ্যাত্মিক জগতে আলোর প্রয়োজন রয়েছে। আর সে আলো হচ্ছেন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)।

৬নং অভিযোগ ঃ কোরান করিমের মাধ্যমে এ কথা বুঝা যাচ্ছে যে, কোরান স্বয়ং উপদেশ, পূর্বাপর শেফা ও রহমত। যেখানে কোরানের মধ্যে এতগুলো গুণাবলী বিদ্যমান আবার নতুন করে অন্য একটি নূর এবং হেদায়তের প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

যেমন পবিত্র কোরান মজিদে রয়েছে-

إِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا.

অর্থাৎ- নিশ্চয় এ আয়াতসমূহ উপদেশ। সুতরাং যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের পথ গ্রহণ করতে পারে। (ছুরা মোজাম্মেল ২৯ পারা)

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا

অর্থাৎ- তোমাদের নিকট স্পষ্ট বর্ণনাকারী নূর অবতীর্ণ করেছি। (ছুরা নিসা ২য় পারা)

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

অর্থাৎ- "উহা এমন একটি কিতাব যাতে- কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ইহা খোদাভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক"। (ছুরা বাকারা ১ম পারা)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ- "আর কোরআনের এমন কতেক আয়াত আমি অবতীর্ণ করছি, যা রোগমুক্তিদাতা এবং মুমীনদের জন্য রহমত"। (ছুরা বনী ইসরাঈল ১৫ পারা)।

قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

অর্থাৎ- "নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বোরহান (প্রমাণ্য) এসেছে।" (ছুরা নিসা ৬ষ্ঠ পারা)

৭নং অভিযোগ ঃ যেহেতু সমস্ত গুণাবলী বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কোরান মজিদ হতে লাভ করেছেন সেহেতু এ গুণাবলী বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নিজস্ব একথা মেনে নেয়া যায় না। কারণ অর্জিত বস্তু পুণরায় অর্জন করা যায় না।

৬ষ্ঠ ও ৭ম অভিযোগের উত্তর ঃ যেমনিভাবে কোরান শেষ আসমানী কিতাব, বিশ্বের জন্য এবং মহাপ্রলয় দিবস অবধির জন্য এসেছে। আর তাই তার মধ্যে এ সমস্ত গুণাবলীর সমাবেশ রয়েছে যে, ইহা অলস ব্যক্তিদের জন্য উপদেশ, বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নূর, পথভ্রষ্টদের জন্য পথ প্রদর্শক, শারীরিক এবং আত্মিক উভয় প্রকারে ব্যাধি হতে মুক্তিদাতা, মুমীনদের জন্য রহমত, মুহাক্কেক ওলামাগণের জন্য দলিল। তেমনিভাবে বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)ও শেষ নবী এবং সমগ্র সৃষ্টির জন্য প্রেরিত। তাই তাঁর মধ্যেও উক্ত গুণাবলীর উপস্থিতি বাঞ্চনীয়। যাতে সৃষ্টি জগতের সকল জাতি তাঁর নিকট থেকে উপকৃত হতে পারে। এ কারণেই মহান আল্লাহ তা'লা ছরকারে দো আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সমস্ত গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, যা কোরানে বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং রসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) উপদেশ দাতা, অথবা পূর্বাপর সমস্ত উপদেশ স্মরণ করিয়ে দাতা, তিনি বোরহান বা দলিল, রোগমুক্তিদাতা এবং রহমত, যেমন কোরআনে করীমে বলা হয়েছে-

فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ

অর্থাৎ "হে নবী! (তাদেরকে) উপদেশ দিন যেহেতু আপনি উপদেশ দাতা"। (ছুরা গাশিয়াহ ৩০ পারা)।

اِنَّكَ تَهْدِيْ اِلٰي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

অর্থাৎ- "নিশ্চয় আপনি সঠিক পথের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। (ছুরা শোরা ২৫ পারা)।

يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا.

"হে মানব সম্প্রদায়, অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে দলিল এসেছে এবং আমি তোমাদের নিকট প্রকাশ্য নূর অবতীর্ণ করেছি।" (ছুরা নিসা ৬ষ্ঠ পারা)

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ হে নবী! আমি আপনাকে পাঠাইনি কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর জন্য রহমত করেই। (ছুরা আম্বিয়া ১৭ পারা)

মোট কথা হল, কোরআনের যেমনি গুণাবলীর কোন শেষ নেই তেমনি ছাহেবে কোরআনেরও বিশেষণের অন্ত নেই। বরং মানুষের তথা সৃষ্টির দেহ জগতের কেবলা হলো কাবা শরীফ আর রূহ ও ঈমান উভয়ের কেবলা হলেন বিশ্বনবী রাহমাতুল্লীল আলামীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)।

সুতরাং এমতাবস্থায় অর্জিত বস্তু পুণরায় অর্জন করার প্রশ্নই উঠেনা। কারণ আমরা পৃথিবীতে দুটি নূরের মুখাপেক্ষী। প্রথমতঃ চক্ষুর নূর, দ্বিতীয়তঃ সূর্যের। যদি চোখের আলো (অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি) থাকে কিন্তু সূর্যের আরো না থাকে তখনও কিছু দেখা যাবে না! তদ্রূপ কোরআনকে সূর্য এবং ছাহেবে কোরআন (দঃ) কে চোখের দৃষ্টিশক্তি অথবা রসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে সূর্য এবং কোরআন মজিদকে চোখের দৃষ্টিশক্তি ধরা যায়। মূলকথা, আমাদের কোরআনের আলোও প্রয়োজন, নবুয়তের নূরও প্রয়োজন। নামাজ কোরআন থেকে পেয়েছি কিন্তু নামাজের রাকাতের সংখ্যা, নামাজের পদ্ধতি বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হতে লাভ করেছি। অনুরূপ জাকাত, হজ্ব ইত্যাদি কোরআন হতে বটে। কিন্তু এইগুলি পালন করার পদ্ধতি রসূলে করিমই (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) শিক্ষা দিয়েছেন। এতে অর্জিত বস্তু পুণরায় অর্জন করা' যেমনি হয়নি, তেমনি অন্যকোণ প্রকারের অসুবিধাও হয়নি। বরং নবুয়তের নূরের প্রয়োজনীয়তা কোরআনের নূরের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা অগ্রগামী। এই কারণেই কোন কাফেরকে কলমা পড়িয়ে মুমীন করা হয়, কোরআন পাঠ করিয়ে নয় এবং নবজাত সন্তানের কানে (শাহাদাতাইন সম্বলিত) আজান উচ্চারণ করা হয়, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা হয় না।

৮নং অভিযোগ ঃ হাদিস শরীফে রয়েছে যে, রসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) দোয়া করতেন 'হে আল্লাহ, আমার চোখে নূর দাও।" এভাবে বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত বলতেন "হে আল্লাহ আমাকে নূরানী (আলোকিত) করে দাও।" যদি তিনি পূর্ব থেকেই নূর হতেন তাহলে এ ধরনের দোয়া করার কারণ কি? ঐ বস্তুকেই তো নূরানী বানানো হয় যা আগে থেকে নূরানী থাকে না।

উত্তর ঃ উত্থাপিত অভিযোগের দুইটি উত্তর রয়েছে। প্রথমটি এলযামী (যুক্তিভিত্তিক), দ্বিতীয়টি তাহকীকি (বিশ্লেষণাত্মক)

১. এলযামী উত্তর হল তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সর্বদা বলতেন-

(ক) اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ অর্থাৎ- হে আল্লাহ আমাকে সঠিক পথের দিশা দান করো। অর্থাৎ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সব সময় হেদায়ত তালাশ করতেন। তার অর্থ কি, তিনি পথভ্রষ্ট ছিলেন? তিনি হেদায়তের উপর থাকা সত্ত্বেও কেন হেদায়ত তালাশ করছেন?

(খ) মহান আল্লাহ বলেন- هُدًى لِّلۡمُتَّقِيۡنَ অর্থাৎ- এ কোরআন খোদাভীরুদের জন্য পথপ্রদর্শক।

(গ) يَا اَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا اٰمِنُوۡا অর্থাৎ- হে ঈমানদারগণ, তোমরা ঈমান আন। এবার বলুন তো, যারা আগে থেকেই খোদাভীরু তাদের কোরআন হেদায়ত করার কি অর্থ? আর যারা ঈমান গ্রহণ করেছেন তাদেরকে ঈমান আনতে বলার কারণ কি?

২. তাহকীকি উত্তর হল এই যে, বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর উক্তি "হে খোদা আমার চোখ, কান ইত্যাদিকে নূরানী করে দাও।" উম্মতকে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে এবং নূরানীয়তের স্থায়ীত্বকেই কামনা করে বলেছেন।

৯নং অভিযোগ ঃ নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে নূর বলা তাঁর সাথে বেয়াদবী করারই নামান্তর, বরং এ কথাতেই তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি হবে যে, তিনি মাটির সৃষ্টি। কারণ মাটি নূর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এ কারণেই ফেরেস্তা নূরের তৈরী হয়ে আদম (আঃ) কে সিজদা করেছেন, আদম (আঃ) ফিরিস্তাকে সিজদা করেননি। তাই হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে নূর মনে করা মানে তাঁর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা, যেহেতু নূর সিজদাকারী এবং মাঠি সিজদাকৃত।

উত্তর ঃ অত্র প্রশ্নেরও দুইটি উত্তর দেয়া যায়, প্রথমটি এলযামী বা যুক্তিমূলক দ্বিতীয়টি তাহকীকি বা বিশ্লেষণমূলক। এলযামী উত্তর হল- অভিযোগের আলোকে বলা যায় যে, আল্লাহকে এবং কোরআনকে নূর বলাও বেয়াদবী হবে। আশ্চর্যের কথা যে, বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে নূর বলাতে আপনার নিকট বেয়াদবী হিসেবে প্রতীয়মান হলো আর আল্লাহকে নূর বলার মধ্যে কি এ ধরণের সমস্ত বেয়াদবী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে? (যেহেতু তাঁরা ইতিপূর্বে আল্লাহকে নূর বলেছেন)। মাশাআল্লাহ এখন ওহাবী দেওবন্দীরাও আদবদার হয়ে গেছে, অথচ তারা রসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে যে ধরণের স্পষ্ট বেয়াদবী করেছে, কাফেরেরাও কখনো সে ধরণের বেয়াদবী করতে পারে নি। তাহকীকি উত্তর হল- আদম (আঃ) এর প্রতি সিজদার লক্ষ্য শুধুমাত্র তাঁর দৈহিক কাঠামোই ছিল না বরং ঐ আত্মাই ছিল যা ঐ দেহের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَاِذَا سَوَّيۡتُهٗ وَنَفَخۡتُ فِيۡهِ مِنۡ رُّوۡحِيۡ فَقَعُوۡا لَهٗ سٰجِدِيۡنَ.

অর্থাৎ- অতঃপর যখন আমি তাঁকে ঠিকঠাক করলাম এবং তাঁর মধ্যে রূহ ফুঁকে দিলাম তখন তারা তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় অবনত হল। (সূরা হাজর, পারা ১৫)

স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, আদম (আঃ) এর আত্মাকেই সিজদা করা হয়েছে। যেহেতু দেহটি ঐ আত্মার আলোক বর্তিকার ধারক হয়েছিল সেহেতু সেও সিজদাকৃত হয়েছে। আর আদম (আঃ) এর রূহ ছিল নূরে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর একটি ঝলক মাত্র। কারণ আদম (আঃ) এর দেহ মুবারক তো রূহ প্রাপ্ত হবার চল্লিশ বছর পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছিল। যদি শুধুমাত্র দেহকে সিজদা করা হয় তাহলে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করার কারণ কি? দেহকে তো প্রথমেই সিজদা করা যেত। তদুপরি ইবলিশের তো মাটির উপর রাখা মাটিকে এবং মাটির দিকে সিজদা করতে কোন আপত্তি ছিল না। যেহেতু সে ইতিপূর্বে মাটির প্রতিটি বালিকণার উপরই সিজদা করেছে এবং আজকেও মাটির উপর সিজদা করে নিত। আজকে যে সিজদা করার আদেশ অমান্য করছে, মূলতঃ ঐ নূরানীয়তকেই অস্বীকার করা হচ্ছে যা বস্তুতঃই সিজদার যোগ্য। তাছাড়া যদি শুধুমাত্র মাটিকেই সিজদা করানো হচ্ছিল তাহলে মাটির স্তুপ তো আরো অনেক ছিল, সেদিকেও তো সিজদা করিয়ে নিলে চলতো।

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, মাটিই সিজদার মুল লক্ষ্যবস্তু ছিল না বরং ঐ নূরই সিজদার লক্ষ্য ছিল যা আদম (আঃ) এর মধ্যে আমানত রাখা হয়েছিল। সময়ের ভাষায় বলেছিল আদম, সিজদার লক্ষ্য ন ই এই অধম।

১০নং অভিযোগ ঃ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যদি নূর হন তাহলে তিনি আদম (আঃ) এর সন্তান হতে পারে না। অথচ তিনি আদম (আঃ) এর সন্তান বলেই তো তাঁকে (উর্দু ভাষায়) "আদমী" বা "আদমের সাথে সম্পর্কিত" বলা হয়।

উত্তর ঃ আমি পূর্বেই বলেছি যে, বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বশর এবং নূর উভয়টি। অর্থাৎ তিনি নূরানী বশর। তাঁর দেহ মোবারক বাহ্যতঃ দৃষ্টিতে বশত কিন্তু মূলত নূর। আদম (আঃ) এর সন্তান বলেই তো জাহেরী বা বাহ্যিক দিক থেকে তিনি বশর। কিন্তু মৌলিকভাবে তিনি সমগ্র সৃষ্টির মুল এবং সমগ্র সৃষ্টি জগত তাঁরই ফসল।

আল্লাহ বলেন-

قُلْ اِنَّ صَلٰوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থাৎ- বলে দিন, নিশ্চয় আমার নামাজ, আমার কোরবানী, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু ঐ সমগ্র জাহানের প্রতিপালনের জন্য যার কোন সমকক্ষ নেই, এতে আমি আদিষ্ট এবং এর প্রতি আমিই প্রথম স্বীকৃতি দানকারী।

قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ.

অর্থাৎ- বলুন, যদি আল্লাহর কোন সন্তান থাকত তাহলে আমিই তার প্রথম উপাসনাকারী হতাম। (ছুরা আম্বিয়া ১২ পারা)

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ.

অর্থাৎ- এমন কোন বস্তু নেই যা আল্লাহর প্রশংসার তছবীহ পাঠ করছে না অথচ তোমরা তাদের তছবীহ অনুধাবন করতে পার না। (ছুরা বনী ইসরাইল ১৫ পারা)

বর্ণিত আয়াত সমূহ হতে দুটি বিষয় জানা গেল। প্রথমটি হল যে, সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বালিকণা, আসমানের প্রতিটি অংশ তছবীহ পাঠ করে এবং প্রতিপালকের উপাসক। দ্বিতীয়টি হল যে, সবকিছুর আগে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ই প্রথম তছবীহ পাঠক। অর্থাৎ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তখন থেকেই উপাসক যখন ফেরেস্তা, আসমান, জমিন, পৃথিবী কোন কিছুই ছিল না। যদি তাঁর আগে অন্য কোন সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করতো, তাহলে সেই প্রথম উপাসক হতো, রসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হতেন না।

আর এ কথাও স্বতঃসিদ্ধ যে, বশরিয়াত এর সুচনা হযরত আদম (আঃ) থেকে। মানুষ বা বশর হিসেবে যদি বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) প্রথম হতেন তাহলে আদম (আঃ) মানব জাতির পিতা হতেন না। তাই এ কথা অবশ্যই মানতে হয় যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সৃষ্টির সূচনা থেকে নূর। এবং শারীরিক দিক থেকে বশর। আর পৃথিবীর সর্বপ্রকার সম্পর্ক ঐ দেহের সাথেই সম্পর্কিত।

হযরত শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ) স্বীয় কিতাব "আততালীফ কলবুল আলীফ বেকিতাবিতিহি ফরহিত তাওয়ালিফ" এর প্রারম্ভিকায় বলেন রূহজগতে সমস্ত নবীগণ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর রূহ মোবারক থেকে ফয়জ হাসিল করেন। তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং তাঁর নিকট থেকেই আদম (আঃ) সব কিছুর নাম শিখে নিয়েছেন। সেই জগতে তিনি নবীগণের নবী, যে পয়গাম্বর যা শিখেছেন সে শিক্ষার জন্য তিনি বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ছাত্র এবং বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) প্রথম শিক্ষক।

রসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং বলেন-

كُنْتُ نَبِيًّا وَّاٰدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ.

"আমি তখনই নবী ছিলাম যখন আদম (আঃ) আত্মা এবং দেহের মধ্যে নিহিত ছিল। সর্বোপরী সমস্ত ফেরেস্তা এবং নূরানী জগতের সমগ্র সৃষ্টি যা কিছু জানে সবকিছু হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর শিক্ষার মাধ্যমেই পেরেছেন। মূল ইবারত নিম্নরূপ-

وصل اول بعد ازنزول وابتقال ازان عالم حضرات انبياء حاضر ان مجلس علم وشاكردان حوزه ـ درس او بريك كتاب از علم وبابي از دين خوانده وتحصيل نموده بود ـ وبر مسند افاضه نشستته كلمات الله بر خلق افاده وافاضه فر مود ـ مقدم ايشان ادم صفي الله امدك باو جود نسبت ابوت ـ دردرس ان خلق صدق زانوا ادب زده صحاح لغات واسماء تعليم نموده بود ـ برمسند خلافت تكيه زده ساكنان ملاء اعلي راتعليم وتلقين نمود ـ وحق استاذي بر ايشان ثابت كر دانيده مخدوم ومسجود ايشان كشت.

অর্থাৎ- পৃথিবীর সমস্ত নবী রসুলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পাঠশালায় উপস্থিত হয়েছেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেক নবী জ্ঞানের একটি কিতাব এবং দ্বীনের এক একটি অধ্যায় বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে অধ্যয়ন করেছেন। সে শিক্ষা থেকে অবসর গ্রহণ করে পৃথিবীকে ফয়জ দানের আসনে সমাসীন হন এবং আল্লাহর বিধি বিধান সৃষ্টি জগতকে শিক্ষাদান করেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন হযরত আদম (আঃ) যিনি পিতা হওয়া সত্বেও স্বীয় সন্তানের পাঠশালায় আদবের সহিত বিনয়াবনত হয়ে সমস্ত ভাষা এবং তাবত বস্তুর নাম তাঁর নিকট থেকে প্রকাশিত হয়, কখন নূরানিয়াতের গুণ প্রকাশিত হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সমস্ত শিক্ষালাভ করেছেন। তারপর আল্লাহর খেলাফতের আসনে সমাসীন হন। এবং নিকটতম ফেরেশতাগণকে শিক্ষা দীক্ষা দানে রত হন। এতে আদম (আঃ) ফেরেশতাকূলের শিক্ষাগুরু হওয়াটা প্রমাণিত হল এবং অবশেষে তাদের সিজদা প্রাপ্ত হন।

১১নং অভিযোগ ঃ বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যদি আল্লাহর নূর হন, তাহলে তিনি ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বাঁধতেন কেন? বিচ্ছুর বিষাক্ত কামড় এবং যাদু তাঁকে আক্রমণ করল কেন? কোন কোন নবীকে আবার কাফেরেরা হত্যা করলো কিভাবে? উহুদ প্রান্তরে বিশ্বনবীর দাঁত মোবারক কেন শহীদ হল? নূরের উপর এসব হতে পারে কি?

উত্তর ঃ উপরোক্ত প্রশ্ন তখনই শোভা পেত এবং যথাযথ হতো যখন আমরা রসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বশর হওয়াকে অস্বীকার করতাম। আমরাতো এ কথাই বলছি যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নূর এবং বশর উভয়টি, কখনো বশরীয়াতের গুণ তাঁর নিকট থেকে গুণাবলীর ধারক করে পাঠিয়েছেন, অভ্যাস মোতাবেক যদি আহার গ্রহণ না করেন তাহলে পেটে তো পাথর বাঁধারই কথা এবং ক্ষুধার তাড়নাও অনুভব হবার কথা। কিন্তু যদি বিরামহীন রোজা পারনের উদ্দেশ্যে আহার বর্জন করেন তখন মাসের পর মাস আহার গ্রহণ না করলেও কোন প্রভাব পড়ে না। যেহেতু প্রথম অবস্থায় বশরীয়াতের বহিঃপ্রকাশ ছিল আর দ্বিতীয় অবস্থায় নূরানীয়াতের প্রতিফলন। এখানে (পৃথিবীতে) বিচ্ছু, তরবারী ও আগুনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছেন আর মিরাজ রজনীতে দোযখ পরিদর্শন করেছেন সেখানে আগুন, বিচ্ছু, সাপ সবকিছু বিদ্যমান, কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। কারণ এখানে বশরীয়াতের জগতে ছিলেন আর সেখানে নূরানীয়াতের জগতে। হযরত ঈসা (আঃ) আসমানের উপর শত শত বৎসর ধরে এমন এক জগতে বসবাস করছেন যেখানে বাতাস নেই, খাদ্য নেই, পানীয় নেই অথচ জীবিত। এটাও নূরানী জীবনের বহি প্রকাশ।

রসূলে আকদাস (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর মর্যাদা তো অনেক ঊর্ধ্বে, কোন কোন সময় তদীয় গোলাম আল্লাহর অলীদেরও এমন সময় আসে যে, মাসের পর মাস পর্যন্ত পানাহার বর্জন করতে থাকেন। তরবারী তাঁদের দেহে প্রভাব ফেলতে পারে না। দজ্জাল আবির্ভূত হলে আল্লাহর জিকিরে মশগুল মোমিনদের ক্ষুধা অনুভূত হবে না। কোন বুজুর্গ ব্যক্তিকে দজ্জাল হত্যা করার পর পুনঃজীবন দান করবে। অতঃপর সে যখন পুনরায় হত্যা করার জন্য তরবারী চালাবে তখন তাঁর গলদেশে তরবারী দ্বারা হত্যা করা যাবে না। নবুয়তের সূর্যের কিরণ প্রাপ্তদের যদি এ অবস্থা হয় তাহলে স্বয়ং সে সূর্যের অবস্থার কথা বলার আর অবকাশ কোথায়?

হযরত শেখ সাদী (রাঃ) কতো সুন্দর বলেছেন। তিনি বলেন- "কখনো স্বীয় স্ত্রীগণের সাথে ব্যস্ত থাকতেন আবার কখনো জিব্রাইল ও মিকাইল পর্যন্ত তাঁর কাছে আসার সাহস করতো না। বস্তুতঃ তাঁর অবস্থা অভিনব এবং অদ্বিতীয়। বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ধরণের।

আপনি কি শোনেননি যে, ইব্রাহীম (আঃ) এর দেহে আগুন এবং ইসমাইল (আঃ) এর গলায় ছুরি কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। এইগুলি তাঁদের নূরানী অবস্থারই আলোকছটা ছিল।

মূলকথা হল বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর নূর। তাঁর মধ্যে বশরীয়াত আছে তবে হযরত জিব্রাইল এর বশরীয়াত অপেক্ষা তাঁর বশরীয়াত অনেক উচ্চমান ও উঁচু দরের।

মাওলানা রুমী (রহঃ) এর ভাষায়- "হে এমন স্বত্বা, যার বশরীয়াতের মধ্যে হাজার হাজার জিব্রাইল নিহিত। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের মত গরীবদের পানে একটি মাত্র শুভ দৃষ্টি প্রদান করুন।"

১২নং অভিযোগ ঃ যদি বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নূর হতেন তাহলে মহাপ্রলয় দিবস অবধি তার সমস্ত বংশধর নূর হতেন। যেহেতু সন্তান তার পিতামাতার 'জাত' হতে হয়ে থাকে। যেমন মানুষের সন্তান মানুষ, বাঘের সন্তান বাঘ। অনুরূপ নূর এর সন্তানও নূর হওয়া চাই। সুতরাং যেহেতু তাঁর উত্তরাধিকারীগণ নূর নন সেহেতু বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)ও নূর নন।

উত্তর ঃ উক্ত প্রশ্নের উত্তর ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সর্বপ্রকার সম্পর্ক বশরিয়াত এর। নূরানীয়তের মধ্যে কারো সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তিনি নূরানীয়তের মধ্যে কারো সন্তানও নন কারো পিতাও নন এবং কারো সাথে কোন প্রকারের সম্পর্কে সম্পর্কিতও নন। নূরানী জগত তো বহু উর্ধ্বে।

কোন আত্মা অন্য আত্মার বংশোদ্ভুত নয়। এ কারণেই রূহানী সন্তান গুণাবলীর মধ্যে পিতা-মাতার সাথে বাহ্যিক আকৃতিতে পরীপন্থীও হয়ে যায়। নবীর সন্তান কাফের, জ্ঞানীর সন্তান মুর্খ, মুর্খের সন্তান জ্ঞানী হয়ে যায়। মোটকথা হল- জন্মগ্রহণ এবং জন্মদান বশরিয়াতের গুণ নুরাণীয়তের নয়।

১৩নং অভিযোগ ঃ কোরআন করিমের মাধ্যমে জানা যায় যে, বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) স্বীয় নবুয়ত লাভের পূর্বে ঈমান ও কোরআন সম্পর্কে কোন খবরও রাখতেন না। আর ওহী অবতীর্ণ হবার পূর্বে নবী হবার কোন আশা ও ছিলনা। তথাপি এটা কিভাবে বিশুদ্ধ কথা যে, তিনি রূহ জগতে নবী ছিলেন? আর সমস্ত নবী পয়গম্বর তাঁর ফয়েজ প্রাপ্ত হয়েছেন। দেখুন আল্লাহ বলেন-

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا اَنْ يُلْقِيَ اِلَيْكَ الْكِتَابُ اِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَّبِّكَ.

অর্থাৎ- তোমার আশাও ছিল না যে, তোমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করা হবে, তবে তোমার প্রতিপালকের করুণাতেই।

وَمَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتَابُ وَمَا الْاِيْمَانُ.

অর্থাৎ- আর আপনি জানতেন না যে, কিতাব কি? আর এটাও না যে, ঈমান কি?

যেখানে ঈমান সম্পর্কে বিশ্বনবীর কোন জ্ঞানই ছিলনা, সেখানে সৃষ্টির পূর্বে নবী হওয়ার কি অর্থ?

উত্তর ঃ অত্র অভিযোগের দুইটি উত্তর রয়েছে। প্রথমটি এলজামী দ্বিতীয়টি তাহকীকি। এলজামী উত্তর হলো এই অভিযোগের আলোকে বলা যায় যে, হযরত ঈসা (আঃ) হুজুর করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। যেহেতু তিনি ভুমিষ্ট হবার কয়েক ঘন্টা পর মায়ের ক্রোড়ে বলেছেন-

قَالَ اِنِّيْ عَبْدُ اللهِ اٰتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا.

অর্থাৎ- তিনি বলেন আমি আল্লাহর বান্দা আমাকে তিনি কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন।

অনুরূপভাবে হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)ও বিশ্বনবী অপেক্ষা উত্তম হবেন। কারণ তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেছেন- وَاٰتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (ছুরা মরিয়ম ১৬ পারা) অর্থাৎ (আল্লাহ বলেন আমি তাকে বাল্য কালে জ্ঞান বা হেকমত প্রদান করেছি) বরং এটাও বলতে হয় যে, কাফের সম্প্রদায়ও রসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) অপেক্ষা জ্ঞানের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। কেননা তারা বিশ্বনবীর বাল্য অবস্থাতেই জানতো যে, তিনি নবী। "বহিরা রাহেব" হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বাল্য অবস্থাতেই তাঁর নবুয়তের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। কারণ তিনি গাছ পাথরকে পর্যন্ত কলেমা পড়তে শুনেছেন।

কোরআনে করিমে এরশাদ হয়েছে- يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ বাকারা ২য় পারা অর্থাৎ কাফেররা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে এমনভাবে চিনে যেভাবে তারা তাদের সন্তানদের চিনে। পিতা যেমন সন্তানদের বাল্য অবস্থা তথা জন্মলগ্ন থেকেই চেনে তদ্রুপ কাফেররাও হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে তাঁর জন্মলগ্ন থেকে চেনে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে-

وَكَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَي الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

অর্থাৎ- তারা (আহলে কিতাব) প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নামের দোহাই দিয়ে আল্লাহর নিকট থেকে কাফেরদের উপর বিজয় কামনা করতো। তাছাড়া বোখারী শরীফে আছে প্রথম ওহী অবতীর্ণ হবার সময় হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হেরা পর্বতে ইবাদত রত ছিলেন এবং পূর্ব থেকেই এতেকাফ যাপন করছিলেন। যদি তাঁর ঈমান সম্পর্কে কোন খবরই না থাকতো তাহলে উপাসনা কার করছিলেন এবং কিভাবে করছিলেন?

তদুপরি মেরাজ রজনীতে হুজুর করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বায়তুল মোকাদ্দাসে সমস্ত নবীর ইমামতি করেছেন। এবার বলুন এটা কোন নামাজ ছিল? তখন নামাজ তো ফরজ হয়নি! তাহকীকি উত্তর একাধিক রয়েছে।

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রঃ) বলেন অভিযোগে উত্থাপিত আয়াতে বাহ্যিকভাবে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে সম্বোধন করা হলেও মুলতঃ সম্বোধন হলো দ্বীন অনুসারীরা। তফসীরে মাদারেক ও খাজেনে وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا সম্পর্ক রয়েছে,

قَالَ اِبْنِ عَبَّاس اَلْخِطَابُ فِي الظَّاهِرِ لِلنَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالْمُرَادُ بِهِ اَهْلُ دِيْنِهِ.

অর্থাৎ- হযরত ইবনে আব্বাছ (রঃ) বলেন, প্রকাশ্যতঃ এ সম্বোধন নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে করা হলেও মুলতঃ এর উদ্দেশ্য তাঁর উম্মতগণ।

(২) প্রথম আয়াতে ماكنت ترجوا এর মধ্যে উল্লেখিত "না" সূচক অর্থ الا رحمة দ্বারা ভংগ হয়ে গেছে। এবং অর্থ হবে এরূপ, বাহ্যিক কারণসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে আপনার এটাও আশা ছিল না যে, আল্লাহর দয়া ব্যতীত আপনার উপর ঐশীবাণী অবতীর্ণ হবে। প্রকাশ থাকে যে, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) শুধুমাত্র আল্লাহর দয়ার মাধ্যমেই নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছেন। কোন নবীর দোয়ার বদৌলতেও নয় এবং কোন নবীর পক্ষ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রেও নয়। যেমনিভাবে হযরত হারুন (আঃ) এর নবুয়ত মুছা (আঃ) এর দোয়ার বদৌলতেই হয়েছে। হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) এর নবুয়ত হযরত জাকারিয়া (আঃ) এর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এবং হযরত সোলায়মান (আঃ) এর নবুয়ত দাউদ (আঃ) এর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। আল্লাহ পাক বলেন-

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ

অর্থাৎ- হযরত সোলায়মান (আঃ) দাউদ (আঃ) এর উত্তরাধিকারী হলেন। (ছুরা নমল ১৯ পারা)

وَاجْعَلْ لِيْ وُزِيْرًا مِنْ اَهْلِيْ هَارُوْنَ اَخِيْ اَشْدُدْ بِهِ اَزْرِيْ

অর্থাৎ- (মুছা (আঃ) দোয়া কররেন হে প্রভু) আমার পরিবারভুক্ত আমার ভাই হারুণকে আমার উজীর বানিয়ে দাও। তার দ্বারা আমার কোমর শক্ত করে দাও। (ছুরা তোয়াহা ১৬ পারা)

কিন্তু হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নবুয়ত লাভের ক্ষেত্রে কারো দোয়াও ছিল না এবং কোন উত্তরাধিকারও ছিল না এবং হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর উপর কোন প্রকার কারো এহছানও ছিল না। দ্বিতীয় আয়াতে وَمَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتَابُ দ্বারা দেরায়তকে অস্বীকার করা হয়েছে। দেরায়ত বলা হয় আন্দাজ করে কোন কিছু জানা। অর্থাৎ তিনি নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে ঈমান এবং কিতাব সম্পর্কে শুধুমাত্র ধারণা বা আন্দাজ করেই জানতেন না। কারণ ধারণার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান কোন কোন সময় ভুলও হয়ে থাকে। বরং তিনি আল্লাহর দেয়া এলহাম দ্বারা জানতেন, যার মধ্যে ভুলের কোন অবকাশ নেই। অথবা এর অর্থ কিতাব ও ঈমান সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞান। অথবা ঈমান অর্থ মুমীন। মোদ্দাকথা হল যে, এর অনেক উত্তর রয়েছে।

১৪নং অভিযোগ ঃ বোখারী শরীফের শুরুতে বর্ণিত হাদিস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) প্রথম ওহী اِقْرَءْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ অবতীর্ণ হল, তখন তিনি হযরত জিব্রাঈল (আঃ) কে চিনতে পারেননি। ওরকা বিন নওফল কর্তৃক বর্ণিত বক্তব্য দ্বারাই চিনতে পেরেছেন যে, তিনি জিব্রাইল। তথাপি এটা কিভাবে হতে পারে যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) স্বীয় নবুয়ত সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবহিত?

উত্তর ঃ এটা নির্লজ্জা মিথ্যা বৈ কিছুই নয়। বোখারী শরীফের এই হাদিসে এমন কোন শব্দ নেই, যার অর্থ এ ধরণের হতে পারে যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) জিব্রাইল (আঃ) কে চিনেন নি। যদি তিনি জিব্রাইলকে না চিনতেন তাহলে আয়াতটি অকাট্য হতো না। কারণ আয়াত অকাট্য তখনই হবে যখন তা আল্লাহর বাক্য হবার মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ থাকবে না। আর যদি তিনি একথাই জানতেন না যে, লোকটি ফেরেশতা না আর কিছু, তাহলে এটার কোন নিশ্চয়তাই থাকতোনা যে, সেটা আল্লাহর কালাম কিনা, আর যদি হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং আয়াতটি আল্লাহর কালাম হবার বিষয়ে সন্দিহান হন তাহলে আমাদের নিকট কিভাবে বিশ্বাস্য হবে? যেহেতু আমাদের বিশ্বাস প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বিশ্বাসের উপরই নির্ভরশীল। তিনি হযরত জিব্রাইলকে চিনেন বলেই জিজ্ঞাসা করেননি যে, তুমি কি? আমাকে কি পড়াতে চাচ্ছ? সুতরাং প্রতীয়মান হলো যে, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) জিব্রাইলকে চিনতেন এবং জানতেন। তিনি চিনবেনই না বা কেন? হযরত জিব্রাইল সহ সমগ্র সৃষ্টি তাঁর নূর হতে সৃষ্ট আর প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নূর সবকিছুর পূর্বে সৃষ্ট।

এবার দেখা যাক ওরাকা বিন নওফলের নিকট তশরীফ নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে। বস্তুতঃ তাঁর কারো নিকট যাওয়া এবং তার নিকট জিজ্ঞাসা করা সর্বসাধারণের গ্রহণ যোগ্যতার জন্যই ছিল। যাতে সাধারণ শ্রোতারা ওরাকার বক্তব্য শ্রবণ করতঃ রসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নবুয়তের বিষয়ে অধিকতর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। কারণ ওরাকা ছিল তওরাত শরীফের মহা পন্ডিত। মক্কাবাসী তার জ্ঞান সম্পর্কে স্বীকৃতি প্রদান করত। আর হযরত খাদিজা (রাঃ) এর সাথে ওরাকার নিকট যাওয়া বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি এবং হযরত খাদিজার নিকট হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নবুয়ত সম্পর্কে চাক্ষুস ধারণা অর্জন করার জন্যই ছিল। যেমনিভাবে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) পাথর দ্বারা কলেমা পড়ানো এবং বৃক্ষ হতে সাক্ষ্য গ্রহণ করা নিজের জ্ঞান অর্জন করার জন্য ছিল না। বরং অন্যদের জানিয়ে দেয়ার জন্যই।

১৫নং অভিযোগ ঃ নূর অপেক্ষা বশর উত্তম। দেখুন, আদম (আঃ) বশর ছিলেন, নূরী ফেরেশতারা তাঁকে সিজদা করেছে। মিরাজ রজনীতে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বশর হওয়া সত্বেও আরশের উপর (যেখানে স্থান কাল পাত্র সবকিছুর সমাপ্ত) পর্যন্ত পৌঁছেছেন, অথচ নূরী ফেরেস্তা জিবরাইল (আঃ) ছিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে। সুতরাং প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে নূর বলা মানে তাঁকে খাট করে দেয়া।

উত্তর ঃ প্রথমতঃ তো বশর নূর অপেক্ষা উত্তম শীর্ষক কায়দাটাই ভ্রান্ত। বস্তুতঃ যদি সেরূপ হতো তাহলে যে কেউ, এমনকি আবু জাহেলও ফেরেশতা অপেক্ষা উত্তম হতো। দ্বিতীয়তঃ এ অভিযোগ তখনই যথাযথ হতো, যখন আমরা বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বশর হওয়াকে অস্বীকার করতাম। তিনি নূর এবং বশর উভয়টি। শুধু মাত্র নূর এবং মাত্র বশর উভয় অবস্থা হতে তিনি উত্তম। সম্ভাব্য যে, কাফেরগণ কুকুর এবং বিড়াল অপেক্ষা নিকৃষ্ট। আল্লাহ পাক বলেন اُولٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ অর্থাৎ তারা (কাফেররা) সৃষ্টির নিকৃষ্টতম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ছায়া বিহীন কায়া

আল্লাহ তা'লা স্বীয় বন্ধুকে দেয়া অসংখ্য মোজেযা সমূহের মধ্যে এটাও একটি মোজেযা যে, তিনি তাঁকে ছায়াবিহীন সৃষ্টি করেছেন। চন্দ্র, সূর্য, চেরাগ ইত্যাদির আলোতে তাঁর দেহ মোবারকের কোন ছায়াই পড়তো না। বরং তাঁর পরিহিত পোষাকও ছায়াবিহীন হয়ে যেতো। এর স্বপক্ষে কোরআনের আয়াত, হাদিসের বাণী, ফকীহগণের উক্তি, স্বয়ং ওহাবী দেওবন্দীদের বক্তব্য বহন করে। যেমন কোরআনে পাকে এরশাদ হচ্ছে-

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ (١)

অর্থাৎ- তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এবং স্পষ্ট কিতাব এসেছে।

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا (الاية) (২)

অর্থাৎ- হে নবী, আমি আপনাকে সাক্ষী , সুসংবাদ দাতা, ভয় প্রদর্শনকারী আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে তাঁর দিকে আহবানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপ করে পাঠিয়েছি।

مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِي الزُّجَاجَةِ (৩)

অর্থাৎ- আল্লাহর নূর হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দৃষ্টান্ত হল- একটি তাকে রাখা প্রদীপের মত, যেটি কাঁচ পাত্রে আবৃত রাখা হয়েছে। আল্লাহ প্রথম আয়াতে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে নূর বলেছেন, দ্বিতীয় আয়াতে প্রদীপ তৃতীয় আয়াতে বিশ্বনবীর স্বত্বাকে নূর এবং বক্ষ মোবারককে কাঁচের তৈরী চিমনী হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন।

আর একথা স্পষ্ট যে, নূর, সূর্য এবং স্বচ্ছ কাঁচ পাতের কোন প্রকার ছায়া হয় না। উক্ত আয়াত সমূহ দ্বারা বিশ্বনবী নূর হওয়া প্রমাণিত।

(৪) তফসীরে 'মাদারিক' এর ১৮' পারায় ছুরা নূর إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ আয়াতের অধীনে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়শা ছিদ্দিকা (রাঃ) কে কতেক লোক (মুনাফিকেরা) অপবাদ দিয়েছে। হুজুর করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সাহাবাদের একটি পরামর্শ সবা ডাকলেন। সভায় হযরত ওসমান গণি (রাঃ) বলেন,

قَالَ عُثْمَانُ إِنَّ اللهَ مَا وَقَعَ ظِلُّكَ عَلَي الْأَرْضِ لِئَلَّايَقَعَ إِنْسَانٌ قَدَمَهُ عَلٰي ذَالِكَ الظِّلِّ فَلَمَّا لَمْ يُمْكِنْ أَحَدًا مِنْ وَضْعِ الْقَدَمِ عَلٰي ظِلِّكَ فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَحَدًا مِنْ تَلْوِيْثِ عِرْضِ زَوْجَتِكَ.

হযরত ওসমান গণি (রাঃ) বলেন হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা'আলা আপনার ছায়া জমিনে ফেলেননি। যাতে কেউ

আপনার ছায়া মারাতে না পারে। যিনি আপনার দেহ মোবারকের উপর পা রাখার সুযোগ কাউকে দেননি। তিনি তাদেরকে আপনার স্ত্রীর চরিত্রের উপর দাগ লাগানোর সুযোগ কিভাবে দিতে পারে?

(৫) হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন,

اَنَّ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنَا قَاطِعٌ بِكِذْبِ الْمُنَافِقِيْنَ لِاَنَّ اللهَ عَصَمَكَ مِنْ وُقُوْعِ الْكِذْبِ عَلٰي جِلْدِكَ لِاَنَّهُ يَقَعُ عَلٰي النَّجَاسَاتِ فَيَتَلَطَّخُ بِهَا فَلَمَّا عَصَمَكَ مِنْ فَالِكِ الْقَدْرِ مِنَ الْقَذْرِ فَكَيْفَ لَا يَعْصِمُكَ مِنْ صُحْبَةِ مَنْ تَكُوْنُ مُتَلَطِّخَةٌ يَمْشِيَ هٰذِهِ الْفَاحِشَةِ.

হযরত ওমর (রাঃ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে বলেন মুনাফেকদের মিথ্যাচার সম্পর্কে আমি নিশ্চিত কারণ আল্লাহ পাক আপনার দেহ মোবারককে মাছি বসা থেকে হেফাজত করেছেন। কেননা মাছি অপবিত্র স্থানে বসে এবং এতে লেপটে যায়। যিনি এই মাছি থেকে আপনাকে রক্ষা করেছেন তিনি এই স্ত্রী থেকে আপনাকে কেন রক্ষা করলেন না যিনি এই অশ্লীল কাজে লেপটে যাবেন।

হযরত ওসমান (রাঃ) এর বক্তব্য দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দেহ মোবারক ছায়াবিহীন এবং হযরত ওমর (রাঃ) এর বক্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, তাঁর দেহ মোবারকে কখনো মাছি বসেনি। দেহ মোবারক ছায়াবিহীন হওয়া যেমন মোজেজা তেমনি দেহ মোবারকে মাছি না বসাও মোজেযা।

(৬) হাকিম তিরমিজী রচিত "নাওয়াদেরুল উলুম" নামক কিতাবে হযরত জাকওয়ান হতে বর্ণনা করেন-

عَنْ ذَكْوَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَكُنْ يُرَ لَهُ ظِلٌّ فِيْ شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ.

অর্থাৎ- হযরত জাকওয়ান হতে বর্ণিত রসূলে আকরম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া মোবারক চন্দ্র এবং সূর্যের আলোতে দৃশ্যমান হতনা।

(৭) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক ও আল্লামা ইবনে জাওযী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন-

قَالَ لَمْ يَكُنْ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ظِلٌّ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ شَمْسٍ اِلَّا غَلَبَهُ ضَوْءُهُ ضَوْئَهَا وَلَامَعَ سِرَاجٍ اِلَّا ضُوْفَهُ ضوفه.

অর্থাৎ- নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া ছিল না। আর যখন তিনি সূর্যের সামনে দাঁড়াতেন তাঁর নূরের জ্যোতিতে সূর্যের আলো ম্লান হয়ে যেত এবং যখন চেরাগের সামনে দাঁড়াতেন তখন তাঁর নূরের সামনে প্রদীপের আলো নিস্তেজ হয়ে যেত।

(৮) ইমাম বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াকুব এর বর্ণনা সূত্রে বলেন,

قَالَ حَجَّجْتُ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَدَخَلْتُ دَارًا بِمَكَّةَ فَرَئَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَجْهُهُ كَدَائِرَةِ الْقَمَرِ.

অর্থাৎ- আবদুল্লাহ বলেন, আমি বিদায় হজ্বে অংশগ্রহণ করলাম। ইত্যবসরে মক্কা শরীফের একটি ঘরে প্রবেশ করে রাসুল করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে দেখলাম তাঁর চেহারা মোবারক যেন গোলাকার চন্দ্রের মতই ছিল।

(৯) ইমাম জালাল উদ্দিন ছুয়ুতী স্বীয় কিতাব "খাছায়েছে কুবরা" তে পূর্বে বর্ণিত জাকওয়ানের হাদিস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একটি অধ্যায় রচনা করেন। এতে বলা হয়েছে-

قَالَ اِبْنُ سَبُعٍ مِنْ فَضَائِلِهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنَّ ظِلَّهُ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَي الْاَرْضِ وَاَنَّهُ كَانَ نُوْرًا فكَانَ اِذَامَشَي فِي الشَّمْسِ اَوِ الْقَمَرِ لَا يُنْظَرُ لَهُ ظِلٌّ.

অর্থাৎ- ইবনে ছমী বলেন, তাঁর বিশেষত্ব সমূহের অন্যতম হলো যে, তাঁর ছায়া মোবারক মাটিতে পতিত হত না। এবং তিনি নূর ছিলেন। তিনি যখন সূর্য অথবা চন্দ্রের আলোতে চলতেন তখন তাঁর ছায়া দেখা যেত না।

(১০) "আল ফওজুল লবীব কি খাছায়েছিল হাবিব" নামক কিতাবের ৪র্থ খন্ডে রয়েছে-

لَمْ يَقَعْ ظِلُّهُ عَلَي الْاَرْضِ وَلَارئي لَهُ ظِلٌّ فِي شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ.

অর্থাৎ- তাঁর ছায়া মাটিতে পড়ত না এবং চন্দ্র, সূর্য কোথাও তাঁর ছায়া পরিলক্ষিত হত না।

(১১) হযরত কাযী আয়াজ (রাঃ) শেফা শরীফের মধ্যে বলেন-

وَمَاذُكِرَ مِنْ اَنَّهُ لَا ظِلَّ لِشَخْصِهِ فِي شَمْسٍ وَلَاقَمَرٍ لِاَنَّهُ كَانَ نُوْرًا.

অর্থাৎ- বিশ্ব নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দেহ মোবারকের ছায়া চন্দ্র, সূর্য কোন কিছুর আলোতে হয় না মর্মে যা বর্ণিত হয়েছে তা এ কারণেই যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নূর ছিলেন।

(১২) হযরত ইমাম শেহাবুদ্দীন খাফাজী তার 'নছিমুর রিয়াজ' নামক কিতাবে বলেন,

وَمِنْ دَلَائِلِ نَبُوَّتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا ذُكِرَ مِنْ اَنَّهُ لَاظِلَّ لِشَخْصِهِ اَىْ جَسَدِهِ الشَّرِيْفِ اللَّطِيْفِ اِذَا كَانَ فِىْ شَمْسٍ اَوْ قَمَرٍ لِاَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نُوْرًا وَالْاَ نْوَارُ شَفَافَةٌ لَطِيْفَةٌ لَا تُحْجِبُ غَيْرَ هَا وَاِلَّا الْاَنْوَارُ لَاظِلَّ بِهَا كَمَا يُشَاهَدُ فِىْ اَنْوَارِ الْحَقِيْقَةِ ـ وَهٰذَا رَوَاهُ صَاحِبُ الْوَفَاءِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاس (رض) قَالَ لَمْ يَكُنْ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ظِلٌّ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ شَمْسٍ اِلَّا غَلَبَ ضُوْءُهُ ضَوْءَ هَا وَلَا مَعْ سِرَاجٍ اِلَّا غَلَبَ ضُوْءُهُ ضَوْئَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ هٰذَا ـ وَالْكَلَامُ فِيْهِ ـ وَقَدْ نَطَقَ الْقُرْاٰنُ بِاَنَّهُ النُّوْرُ الْمُبِيْنِ وَكَوْنُهُ بَشَرًا لَايُنَا فِيْهِ كَمَا تُرُهِمْ فَاِنْ فَهِمْتَ فَهُوَ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ فَاِنَّ النُّوْرَ هُوَ الظَّاهِرُ بِنَفْسِهِ وَالْمُظْهِرُ بِغَيْرِهِ ـ وَتَفْصِيْلُهُ فِىْ مِشْكوٰةِ الْاَنْوَارِ.

অর্থাৎ- প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নবুয়তের প্রমাণ সমূহের মধ্যে যা উল্লেখ করা হয়েছে তাও অন্তর্ভূক্ত। তা এই যে, তিনি যখন চন্দ্র সূর্যের আলোতে দাঁড়াতেন তাঁর দেহ মোবারকের ছায়া হতো না যেহেতু তিনি নূর। নূর স্বচ্ছ ও ওজনহীন হওয়া স্বাভাবিক, তা কোন প্রকারে বাধা প্রাপ্ত হয় না এবং ছায়াও হয় না, যেমনিভাবে আলোতে পরিলক্ষিত হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হতে 'ওয়াফা" নামক কিতাবের লেখক রওয়ায়েত করেছেন যে, রসুল করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া ছিল না। আর যখন তিনি সূর্য এবং প্রদীপের আলোতে দাঁড়াতেন তখন তাঁর নূর সূর্য এবং প্রদীপের আলোকে ম্লান করে দিতেন। এটা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে, তিনি নূরে মুবীন। তবে তিনি বশর হওয়া নূর হওয়াকে অস্বীকার করে না, যেভাবে কারো কারো ধারণা হয়েছে। যদি তুমি বুঝতে পার তাহলে তিনি নূরের উপর নূর। কেননা নূর ওটাই যা নিজেও আলোকিত এবং অন্যকেও আলো দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনা মিশকাতুল আনোয়ারে রয়েছে। (সংক্ষেপিত)

(১৩) মসনবী শরীফে মাওলানা জালালউদ্দীন রুমী (রঃ) বলেছেন,

او محمد دارب سایہ - جو فناش از فقر پیری بود

যে ব্যক্তি মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নূরের মধ্যে উৎসর্গিত হবে সেও তাঁর মতো ছায়াবিহীন হয়ে যাবে।

মওলানা আবদুল আলী "বাহরুল উলুম" নামক মসনবী শরীফের শরাহ কিতাবে বলেন-

مصرع ثانی بمعجزه آن سرور صلی الله علیه وسلم که آن سرور صلی الله علیه وسلم راسایه نمی افتاد

দ্বিতীয় পংক্তিতে রসুল করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর মোজেযার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁর ছায়া পরিলক্ষিত হতো না।

(১৪) মওয়াহেবে লুদুন্নিয়া নামক কিতাবে ইমাম আহমদ বিন মোহাম্মদ খতীব কাছতালানী বলেন,

لَمْ يَكُنْ لَهُ ظِلٌّ فِىْ شَمْسٍ وَّلَا قَمَرٍ

অর্থাৎ- হযরত জাকওয়ান হতে তিরমিজি শরীফে বর্ণিত যে, হুজুরের কোন প্রকার ছায়া চন্দ্র এবং সূর্যে কোথাও ছিল না।

(১৫) আল্লামা হোসাইন ইবনে মোহাম্মদ ওয়াহাব স্বীয় গ্রন্থ "কিতাবুল হামছিন ফি আহওয়ালিন নপসিন নাফিছ" এ বলেন,

لَمْ يَقَعْ ظِلُّهٗ عَلَى الْاَرْضِ وَلَا رُئِىَ لَهٗ ظِلٌّ فِىْ شَمْسٍ وَّلَاقَمَرٍ

অর্থাৎ- তাঁর ছায়া জমীনের উপর পড়ে নাই। আর চন্দ্র এবং সূর্য কোথাও দেখা যায়নি।

(১৬) "নুরুল আবছার ফি মানকিবে আ'লেন নবীয়্যিল আতহার" কিতাবে রয়েছে-

لَمْ يَقَعْ ظِلُّهٗ عَلَى الْاَرْضِ وَلَا رُئِىَ لَهٗ ظِلٌّ فِىْ شَمْسٍ وَّلَا فِىْ قَمَرٍ

বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া জমিনের মধ্যে পড়ত না এবং চন্দ্র, সূর্যে কোথাও পরিলক্ষিত হত না।

(১৭) ইমাম ইবনে হাজার মক্কী (রহঃ) "আপজালুল কুরা" নামক কিতাবে লিখেছেন,

وَمِمَّا يُؤَيِّدُ اَنَّهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَارَ نُوْرًا اِذَا كَانَ يَمْشِىْ فِى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَا يُظْهِرُ لَهٗ ظِلٌّ لِاَنَّهٗ لَا يُظْهِرُ لَهٗ ظِلٌّ لَا يُظْهِرُ اِلَّا بِكَثْفٍ وَهُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ خَلَّصَهُ اللهُ عَنْ سَائِرِ الْكَثَافَاتِ الْجِسْمَانِيَّةِ وَصَيَّرَهٗ نُوْرًا صَرْفًا لَا يُظْهِرُ لَهٗ ظِلٌّ اَصْلًا.

প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নূর হবার স্বপক্ষে যে সমস্ত প্রমাণ রয়েছে, তম্মধ্যে এটাও একটি যে, তিনি যখন চন্দ্র ও সূর্যের আলোতে চলতেন তখন তাঁর ছায়া প্রকাশ পেত না। কারণ স্থূল বস্তুরই ছায়া হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সর্ব প্রকার দৈহিক স্থূলতা থেকে মুক্ত করেছেন। এবং তাঁকে খাটি নূর হিসেবে তৈরী করেছেন তাই তাঁর ছায়া প্রকাশ পেত না।

(১৮) শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী (রাঃ) স্বীয় কিতাব "মুদারেজুন নবওয়াতে" লিখেছেন,

ونبود بران حضرت صلى الله عليه وسلم راسايه در افتات ونه در قمر

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া চন্দ্র এবং সূর্যে কোথাও ছিল না।

(১৯) মুজাদ্দেদে আলফেছানী (রঃ) "মকতুবাতের" তৃতীয় খন্ডে লিখেছেন, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া ছিল না। পার্থিব জগতে প্রত্যেক দেহের ছায়া দেহ হতে হাল্কা হয়ে থাকে। যেখানে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দেহ মোবারক অপেক্ষা আর কোন কিছু হাল্কা ছিল না সেখানে তাঁর ছায়ার কি অবস্থা হতে পারে।

(২০) হযরত শাহ আবদুল আজিজ (রহঃ) "তফসীরে আজিজী" শরীফের ৩০তম পারায় ছুরা "ওয়াদ্দুহা" এর তফসীরে বলেন, তাঁর ছায়া জমীনে পড়তনা।

(২১) "শরহে শেফা" এর উদ্ধৃতি দিয়ে মাজমাউল বিহারে বলা হয়েছে,

وَمِنْ اَسْمَائِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النُّوْرُ - قِيْلَ مِنْ خَصَائِصِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ اِذَا مَشٰى فِى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَا يَظْهَرُ لَهٗ ظِلٌّ.

অর্থাৎ- তাঁর অন্যান্য নাম মোবারকের মধ্যে নূরও একটি। তিনি যখন চন্দ্র, এবং সূর্যে চলতেন তখন ছায়া প্রকাশ পেত না।

(২২) "ফতুহাতে আহমদিয়া শহরে হামজিয়া" নামক কিতাবে আল্লামা ছোবহান হামলী বলেন,

لَمْ يَكُنْ لَهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ مَا يَظْهَرُ فِى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

অর্থাৎ- বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া ছিল না, যা চন্দ্র এবং সূর্যে প্রকাশ পেত না।

(২৩) আল্লামা ইউছুফ নিবহানী "জাওয়াহেরুল বিহারে" ১ম খন্ডে ৪৫৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

وَكَانَ اِذَا مَشٰى فِى قَمَرٍ اَوْشَمْسٍ لَا يَظْهَرُ لَهٗ ظِلٌّ

অর্থাৎ- যখন তিনি চলতেন তখন চন্দ্র সূর্য কোথাও তাঁর ছায়া প্রকাশ পেত না।

উল্লেখিত হাদিস ও আলেমগণের বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া মূলত ছিলই না। না ছিল সূর্যের আলোতে, না চন্দ্রের কিরণে এবং না চেরাগের আলোতেও।

দেওবন্দী ওহাবীদের বক্তব্য

বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দেহ মোবারকের ছায়া না থাকার বিষয়টি দেওবন্দী ওহাবী ওলামারা এবং গায়রে মুকাল্লেদরাও মেনে নেয় এবং এর স্বপক্ষে জোরালো প্রমাণ সমূহ উপস্থাপন করে। জানি না বর্তমান দেওবন্দীদের কি হয়েছে যে, তারা স্বীয় মুরুব্বীদেরকেও মানতে পারছেনা। শুধু তাই নয় তারা রীতিমতো বিষয়টি অস্বীকার করে আসছে। আল্লাহ তাদেরকে অনুধাবন করার শক্তি দিন এবং বিরোধীতা না করে সত্য মেনে নেয়ার তৌফিক দান করুন।

দেওবন্দের পেশোয়া মৌলভী রশিদ আহমদ গাংগুহী স্বীয় কিতাব এমদাদুচ্ছুলুকের ৮৬ পৃষ্ঠায় লিখেন এ কথা মুতাওয়াতের সনদ দ্বারা (অর্থাৎ বিশ্বাসযোগ্য ভাবে) প্রমাণিত যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া ছিল না। আর প্রকাশ থাকে যে, নূর ব্যতীত সকল বস্তুরই ছায়া রয়েছে। বন্ধুগণ! এ বিশ্বাস হলো সে মৌলভী রশিদ আহমদ গাংগুহীর, যিনি দেওবন্দীদের বড় পীর, সমসাময়িক কালের তথাকথিত কুতুব এবং আরো কত কি?

লা-মাযহাবী আহলে হাদীসের নামকরা আলেম হাফেজ মুহাম্মদ সাহেব লক্ষ্মবী স্বীয় 'তফসীরে মুহাম্মদী' এর সপ্তম মনজিল ৪২৯ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, হুজুরের পবিত্র শরীর ছায়াবিহীন।

যুক্তির আলোকে ঃ বিবেকের চাওয়াও এটা যে, প্রিয় নবীর ছায়া না হোক। কারণ দেহ জগতে এমন কিছু দেহ রয়েছে যাদের ছায়া হয় না। অর্থাৎ ঐগুলোর দেহ আছে বটে কিন্তু ছায়া থাকে না। অথবা এ কারণেই যে, ঐ দেহের উপর আল্লাহ তা'লা নূরের প্রলেপ মেখে দিয়েছেন। অথবা এ কারণেই যে, দেহ স্বচ্ছ। দেখুন চন্দ্র, সূর্য এবং তারকা দেহ বিশিষ্ট অথচ তার ছায়া নেই। কারণ তার উপর নূরের প্রলেপ রয়েছে। চন্দ্র স্বত্বাগতভাবে কাল; সূর্যের আলোতে আলোকিত হয়েছে। এই বাহ্যিক আলোর কারণে তার ছায়া নেই। স্বচ্ছ পরিস্কার শিশারও ছায়া হয় না। অনেকবার পরীক্ষিত। শিশা নূর নয়; শুধু মাত্র স্বচ্ছতাই তাকে ছায়াবিহীন করে দিয়েছে। কোন কোন সময় স্থুল দেহেরও ছায়া হয় না। যখন চতুর্দিক থেকে তার উপর আলো দেয়া হয় অথবা বিদ্যুৎ এর নীচে যখন দাঁড়ায় তখন তার ছায়া হয় না। কারণ আলো তাকে ঘিরে রেখেছে। গ্রীষ্মকালে যখন দ্বিপ্রহরে মাথার ঠিক উপরে সূর্য থাকে তখন মানুষ তথা কোন দেহের ছায়া হয় না। কারণ সূর্যের আলো তার দেহের প্রতিটি অংশের উপর পড়ে। যদি বিদ্যুতের প্রকট আলোতে আলোকিত একটি বাল্ব দ্বারা আলো বিস্তার করা হয় তাহলে সেটা নূরের উপর নূর হবে। সেখানে ছায়া পড়ার কোন কথাই আসতে পারে না। যেখানে বাহ্যিক আলোর কারণে ছায়া দূরীভূত হয়ে যায়, সেখানে যে বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে আল্লাহ তা'লা নূরের দেহ বলে আখ্যায়িত করেছেন, প্রিয়নবী স্বয়ং দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ আমাকে নূর করে দাও, কোরানে পাকে নূরের উপর নূর বলেছেন, সে দেহের ছায়া না থাকাতে আশ্চার্য হবার কি আছে? উল্লেখিত সমস্ত দেহকে ছায়াবিহীন মেনে নেয়া যেতে পারে কিন্তু প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে ছায়াবিহীন মানতে নারাজ কেন?

দ্বিতীয় অধ্যায় - দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রশ্নোত্তর পর্ব

ছায়াবিহীন কায়া সম্পর্কে বিরোধীতাকারীদের নিকট কোন জোরালো অভিযোগ নেই। শুধুমাত্র দুই তিনটি সন্দেহ বিদ্যমান, যা সব সময় সর্বত্র বলে বেড়ায়। আমরা নিম্নে তাদের উক্ত সন্দেহমূলক আপত্তিসমূহ উত্তর সমেত পেশ করছি। আল্লাহ তা'লা কবুল করুন।

এক. মনসদে আহমদে বিবি ছুফিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

قَالَتْ بَيْنَمَا اَنَّ يَوْمًا بِنِصْفِ النَّهَارِ وَاِذَا اَنَا بِظِلِّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ- তিনি বলেন একদা দ্বিপ্রহরে রসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ছায়ার মধ্যে ছিলাম। দেখুন, হযরত ছুফিয়া বলেন যে, আমি হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ছায়ার মধ্যে ছিলাম। যদি তাঁর ছায়া না থাকতো, তাহলে ছুফিয়া কিভাবে ছায়ার মধ্যে ছিলেন? 'জিল' শব্দটি সম্পর্কে আলোচনা করুন, ছায়াকেই (আরবীতে) জিল বলা হয়। জ্ঞাতব্য ঃ দেওবন্দী ওহাবীর নিকট অত্র হাদীস ব্যতীত বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া প্রমাণ করার জন্য আর কোন হাদীস মিলেনি, অত্র হাদিসটিকে তারা অত্যন্ত গর্ব সহকারে পেশ করেন।

জবাব ঃ বর্ণিত হাদিসে 'জিল' শব্দটির অর্থ সাধারণ ছায়া নয়। যা স্থুল বস্তু হতে সৃষ্টি হয়। মদিনা মোনাওয়ারায় ঠিক দ্বিপ্রহরে এ ধরণের ছায়া পড়েই না। আর এমন দীর্ঘ ছায়া যার মধ্যে আর একজন ব্যক্তি চলতে পারে এরূপ ছায়া গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশেও তো পড়ে না। সুতরাং এখানে ছায়া আরবী ভাষা মোতাবেক দয়া ও মেহেরবাণীকে বুঝানো হয়েছে। যেমন কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে বলা হয় دام ظلهم অথবা مد ظلهم। অর্থাৎ- তাঁর ছায়া সর্বদা থাকুক, দীর্ঘ হোক। এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি রাত দিন সূর্যের আলোতে দাঁড়িয়ে থাকুক আর তাঁর ছায়া পড়তে থাকুক। বরং এটাই যে, তাঁর দয়া মেহেরবানী সর্বদা অব্যাহত থাকুক।

হাদীস শরীফে আছে اَلسُّلْطَانُ الْعَادِلُ الْمُتَوَاضِعُ ظِلُّ اللهِ

অর্থাৎ- বিনয়ী ন্যায় পরায়ন বাদশা আল্লাহর ছায়া স্বরূপ। হাদীস শরীফে আরও আছে, سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِه

অর্থাৎ- সাতজন ব্যক্তিকে আল্লাহ তার আরশের ছায়া তলে স্থান দিবেন। দেখুন, আল্লাহর কোন স্থুল দেহ নেই যা থেকে ছায়া হতে পারে এবং আরশও ছায়াদানকারী নয়। সুতরাং উভয় হাদিসে ছায়া অর্থ রহমতই হবে। হাদীস শরীফে আরো রয়েছে,

اِنَّ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةً تَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلِّهَا مِئَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا

অর্থাৎ- বেহেশতে একটি বৃক্ষ রয়েছে যার ছায়ায় একজন ভ্রমণকারী ১০০ বৎসর চলতে থাকলেও তা অতিক্রম করতে পারবেনা। (বোখারী, মুসলিম-বাবু ছিফাতিল জান্নাত)

দেখুন, বেহেশতে সূর্যও নেই চন্দ্রও নেই, তথাপি বৃক্ষের ছায়া বলতে কি বুঝানো হয়েছে? নিশ্চয় এখানেও ছায়া দ্বারা আশ্রয় এবং নীচে বুঝানো হয়েছে। তাঁদের পেশকৃত হাদিসে যদি ছায়া দ্বারা সাধারণ ছায়াকে বুঝানো হয়, তাহলে অত্র হাদিসেরও পরিপন্থী হবে এবং ঐ সমস্ত কোরআনের আয়াতেরও পরিপন্থী হবে যা ইতি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

দুই. পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক বলেন,

يَتَفَيَّئُا ظِلَالُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشَّمَالِ

অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, প্রত্যেক বস্তু তার ছায়া সমেত আল্লাহকে সিজদা করে। যদি বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া না থাকে তাহলে তিনি অন্যান্য ইবাদতকারী অপেক্ষা তুলনামূলক কম উপসনাকারী হবেন। সমগ্র সৃষ্টির দুই সিজদা আর প্রিয়নবীর এক সিজদা। সুতরাং তাঁর ছায়া ছিল যাতে তাঁর ইবাদতও দ্বিগুণ হয়।

জবাব ঃ উক্ত বক্তব্যের উত্তর দুই ভাবে দেয়া যায়। এলজামী ও তাহকীকি। **এলজামী উত্তর ঃ** উক্ত বক্তব্য হতে বুঝা যায় যে, যখন কোন দেওবন্দী ছায়ায় নামাজ পড়ে সেখানে তার ছায়া পড়ে না। সাথে সাথে কোন জন্তু রৌদ্রে দাঁড়িয়ে আছে যার ছায়া পড়ছে। তখন উক্ত দেওবন্দী থেকে ঐ জন্তুটি উত্তম হবে। যেহেতু দেওবন্দী ব্যক্তিটি শুধুমাত্র নিজেই ইবাদত করেছে আর জন্তুটি ছায়া সমেত। এখানে আপনি যে উত্তর দেবেন ওখানেও সে বক্তব্য পেশ করুন।

তাহকীকি উত্তর ঃ বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর একটি সিজদা সমগ্র সৃষ্টির সারা জীবনের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম হবে। যেখানে নবীর সাহাবাদের সোয়া সের যব দান করা আমাদের পর্বতসম স্বর্ণ দান করা অপেক্ষা উত্তম হয়, সেখানে বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ইবাদতের

কথা আর কি বলা যাবে? কোন বস্তু ছায়া বিশিষ্ট হোক কিংবা ছায়া বিহীন তা কোন অবস্থাতেই প্রিয় নবীর মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

মৌলভী সাহেব! ভবিষ্যতে আপনি এবং আপনার দলবল সর্বদা রৌদ্রে নামাজ পড়বেন, যাতে দ্বিগুণ সিজদা আদায় হয়।

তিন. আল্লাহ তা'লা কোরআনে মজীদে বলেছেন, قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

বলুন নিশ্চয় আমি তোমাদের মত বশর! বর্ণিত আয়াত অনুযায়ী হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমাদের মতো। অথচ আমরা ছায়াবিহীন নই সুতরাং হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ছায়াবিহীন হবেন না। অন্যথায় আমাদের মতো হন কিভাবে?

জবাব ঃ এর উত্তরও দুই ভাবে দেয়া যায়। এলজামী ও তাহকীকি। **এলজামী উত্তর ঃ** হুজুর আমাদের মতো। অথচ আমরা নবীও নই রসূলও নই, শফিউল মুজনেবীনও নই রাহমাতুল্লীল আলামীনও নই। তাহলে (নউজুবিল্লাহ) তিনিও নবী, রসূল, রাহমাতুল্লিল আলামীন ও শফিউল মুজনেবীনও নন।

এর এ ধরণের তফসীরের মাধ্যমে বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নবুয়ত রেসালত সবকিছুকে অস্বীকার করা হয়।

তাহকীকি উত্তর ঃ উক্ত আয়াতে প্রিয় নবীর সাথে আমাদের মিল সেখানেই যে, তিনি অন্যান্য বান্দাদের খোদা নন, আল্লাহর সন্তানও নন, আত্মীয়ও নন আল্লাহর খাঁটি বান্দা। তাঁর মধ্যে খোদায়িত্বের অবকাশ নেই। বিরুদ্ধাবাদীদের নিকট ছায়া বিদ্যমান থাকার স্বপক্ষে জোড়ালো কোন প্রমাণ নেই। শুধুমাত্র শত্রুতা বশতঃ অস্বীকার করছে। কতেক সন্দেহকে দলীল মনে করছে। আমরা তো কোরআনের আয়াত, নবীর হাদীস, বুজুর্গানে দ্বীনের উক্তি বিবেকগ্রাহ্য প্রমাণাদিও তাদের বুজুর্গগণের বক্তব্য পেশ করলাম। তারাও ছায়া বিদ্যমান থাকার পক্ষে কোরআনের আয়াত, হাদিস, সাহাবীর বক্তব্য পেশ করুক। যদি পেশ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে বিশ্বনবীর একটি মোজেযা এবং তার পরিপূর্ণতাকে কেন অস্বীকার করবে?

অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, অন্যান্য সম্প্রদায় নিজেদের বুজুর্গগণের মিথ্যা গুণাবলী বর্ণনা করে আর তারা নিজ নবীর সত্য গুণাবলী মানতে নারাজ। যদি

ইত্যকার লাখ লাখ গুণাবলী আল্লাহ তার হাবিবকে প্রদান করেন এতে তাদের অসুবিধা কোথায়? আল্লাহ সে চোখ দান করুন যা প্রিয় নবীর সেই গুণাবলী দর্শনে সক্ষম হয়। বন্ধুগণ! বাহ্যিক চোখ সুরমা দ্বারা সুন্দর হয় কিন্তু অন্তরের চক্ষু আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের পদধুলি দ্বারা আলোকিত হয়। কোন বুজুর্গ ব্যক্তির দরবারের ধুলা চোখে লাগাও এতে চোখের দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি লাভ করবে। প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে আবু জাহেল শুধু কপালের চোখে দেখেছিল। তাই কাফের থেকে গেছে আর হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রঃ) অন্তরের চোখে দেখেছিলেন। তাই মোমেন সাহাবী হয়েছে।

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া এ জন্যেই ছিল না যে, ছায়া দেহ অপেক্ষা হালকা হয় যেমন দেওয়াল, বৃক্ষ ইত্যাদির ছায়া দেহ অপেক্ষা হালকা। প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া যদি তার দেহ অপেক্ষা হালকা হয় তাহলে তাঁর দেহ মোবারক হালকা হবার গুণ হ্রাস পাবে। বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া বিহীন হওয়ার এত অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে যে, যদি ইহা একটি এজমা সমর্থিত মাছয়ালা বলা হয় অত্যুক্তি হবে না।

জানিনা, বিরুদ্ধ বাদীদের এটা মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? অথচ ইহা কোন আশ্চার্যজনক কথাও নয়। আল্লাহ হবারও কোন চিহ্ন নয়। যদি তা হতো তাহলে অন্ততঃ শিরক হবার ভয় হতো। পৃথিবীতে কোটি কোটি বস্তু ছায়াবিহীন। অথচ তা মেনে নিতে তাদের কোন দ্বিধা নেই।

সমাপ্ত